উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস।

পিতাঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু

দেব,

"পলাশবনে"র ন্যায় তুচ্ছ গ্রন্থ আপনার শ্রীচরণে অর্পিত হইবার যোগ্য নহে। তবে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদিত বলিয়া, আপনার নিকট ইহা অনাদৃত হইবে না, এই ভরসায়, আপনার পবিত্র চরণকমলে ইহা অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই সামান্য ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করিলে, কৃতার্থ হইব। নিবেদনমিতি

আজিমগঞ্জ
কার্ত্তিক, ১৩১৪।

প্রণত
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

বিজ্ঞাপন।

"পলাশ-বন" ঠিক্ উপন্যাস-গ্রন্থ নহে। উপন্যাসের অধিকাংশ লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান নাই। ইহাকে একটী কাল্পনিক গার্হস্থ্য চিত্র মাত্র বলা যাইতে পারে। যাঁহারা উপন্যাসপাঠের তীব্র আনন্দলাভ-প্রত্যাশায় ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ নিরাশ হইবেন। আর পলাশবনে, সামান্য কিংশুক ব্যতীত, দেবদুর্লভ পরিজাত-কুসুমের অনুসন্ধান করিলেও পাঠকবর্গ নিশ্চিত ভগ্নোমনোরথ হইবেন। ইতি

"সূর্য্যে প্রখরতা আছে চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, মিষ্টে পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু রামায়ণ সাহিত্য জগতে এক অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তু, আজন্ম কাল হইতে আমরা তাহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি, তাহা পাঠ করিতেছি তাহাতে আমাদের অরুচি নাই, প্রিয়তমের ন্যায় ইহা চিরমাধুর্য্যময় সদানন্দদায়ক। রামায়ণের এই যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, 'সীতাতে' তাহা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে, ইহা লেখকের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। বইখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। ভাষা অতি সরল, সুন্দর; বর্ণনা লালিত্য মনোহর। অধিকাংশ বর্ণনা মূল রামায়ণ হইতে অনুবাদিত। সীতার বনবাসাংশ অবশেষে যজ্ঞ স্থলে তাঁহার প্রাণত্যাগ অতি মনোহর ভাবে হৃদয়াদ্রকারী।"

ভারতী বালক।

"উপস্থিত গ্রন্থে পবিত্রময়ী পতিব্রতা সীতার চরিত্র বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল; পাঠ করিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আমোদে সময় অতিবাহিত হয়, সেইরূপ প্রভূত নীতিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই গ্রন্থ পাঠে সমস্ত রামায়ণের আভাস জানিতে পারা যায়। "সীতা" অস্মদ্দেশের কুলকামিনীগণের একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ; যাঁহারা পবিত্রভাবে পবিত্রতার কথা পড়িয়া আমোদিত হয়েন, তাঁহারা ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি "সীতা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত।

"সীতা" একখানি সুপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা আদর্শ চরিত্রের একখানি আদর্শ পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সীতার ন্যায় আরও গ্রন্থ রচনা করিলে, বাঙ্গালী অবিনাশ বাবুকে সোণার দোয়াত কলম দিবে। বঙ্গবাসী।

"ইহা শুদ্ধ সীতাচরিত্রের সমালোচনা নহে। গ্রন্থকার প্রাঞ্জলভাষায় রামায়ণ অবলম্বন করিয়া, সীতাচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সুন্দর —বিশেষত: স্ত্রীলোকের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।" হিতবাদী।

"সীতা-চরিত্র অনেকে লিখিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় এমন সুন্দর করিয়া কেহ বুঝি সীতা-চরিত্র অঙ্কন করেন নাই।

"সীতা" বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। এমন সুন্দর ভাষা, ভাষায় এমন তেজ প্রায় দেখা যায় না। অবিনাশ বাবু "সীতায় জন্যই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইঁহার লেখনী অক্লান্ত থাকিয়া বঙ্গভাষায় উন্নতি করুক, বাঙ্গালীর জন্য সুখপাঠ্য উন্নত নীতিপূর্ণ গ্রন্থ উপস্থিত করুক।" সঞ্জীবনী।

"ললনাকুলশিরোমণি সীতাদেবীর স্বর্গীয় সমুন্নত চরিত্র প্রতিফলিত করিয়া আমাদের এই নবীন গ্রন্থকার, বাঙ্গালা সমাজের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।" নবযুগ।

গ্রন্থকার যে আকারে বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ বঙ্গানুবাদ সীতাচরিত্র বঙ্গভাষায় অদ্যাপি আর হয় নাই। পরিণয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবনবৃত্তান্ত এ পুস্তকে অতি দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার অবশ্য পাঠ্য।" নব্যভারত।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুর্য্য সকলই অতীব প্রশংসনীয় কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণে যে অতুলনা স্বর্গের ছবি সীতাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, অবিনাশ বাবু তাহা বাঙ্গালা রঙ্গে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এ চিত্র সুন্দর হইয়াছে। পাঠিকাগণ আদর্শসতী সীতার যথোচিত সমাদর করিবেন, এজন্য অনুরোধ করা বাহুল্যমাত্র।"

বামাবোধিনী।

পলাশ-বন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
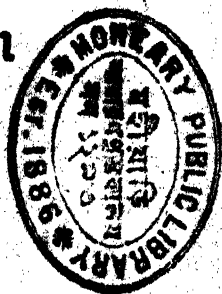
আমি বাল্যকালে পশ্চিম-বঙ্গে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমার পিতাঠাকুর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোনও উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া বহুকাল এই অঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক বলিয়া, তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক, এই দেশেই বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে তিনি দেবীপুর নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামের সন্নিহিত একটী মনোরম পল্লীতে কিয়দ্দিন বাস করেন। আমার অগ্রজ ভ্রাতারা কলিকাতায় থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম বলিয়াই হউক, কিম্বা দেবীপুরে আমার বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট উপযু

বিদ্যমান ছিল বলিয়াই হউক, কিম্বা আর যে কোনও কারণে হউক, আমি পিতামাতারই নিকটে অবস্থান করিতাম। দেবীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে, আমি স্বদেশে আমাদের গ্রামস্থ বঙ্গ-বিদ্যালয়ে কিয়দ্দিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম।

আমাদের আবাসবাটী পল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। তাহার অনতিদূরেই একটী পর্ব্বত; কিন্তু তাহা বৃক্ষলতাচ্ছন্ন ছিল না; কতিপয় আরণ্য বৃক্ষমাত্র তাহার নগ্ন কৃষ্ণদেহের শোভা বর্দ্ধন করিত। তত্রত্য অধিবাসীরা বলিত, পূর্ব্বে পর্ব্বতটি নিবিড় জঙ্গলে সমাবৃত ছিল; ক্রমে পল্লীর স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সেই জঙ্গল এবং তদধিবাসী ব্যাঘ্রভল্লুকাদিও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক, বৃক্ষ লতা না থাকায়, পর্ব্বতটি দূর হইতে ভীষণ দেখাইত। তাহাতে আবার লোকে তাহাকে নানা দেবতা ও উপদেবতার বিহার-স্থল কল্পনা করিয়া, তাহার ভীষণতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। দেবতাদের উদ্দেশে পূজা ও বলি দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনও কারণে কেহ তাহার উপর আরোহণ করিত না। কিন্তু আমি প্রায়শঃ এই নিয়মের লঙ্ঘন করিতাম। লঙ্ঘন করিয়া মধ্যে মধ্যে জননীর তিরস্কার ও পিতৃদেবের কঠোর তাড়না পর্য্যন্ত সহ্য করিতাম।

পর্ব্বতে আরোহণ করিবার প্রবৃত্তি আমাতে কিরূপ প্রবল ছিল, জনক জননী তাহা অবগত ছিলেন না। স্বদেশে বঙ্গবিদ্যালয়ে যখন পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, নদী নির্ঝরের কথা পাঠ করিতাম, তখন পর্ব্বত কখন নয়নগোচর না করিলেও, আমি মানসপটে তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইতাম; কল্পনার সাহায্যে বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম, এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের বক্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কত মনোরম প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। যে দিন পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়া সত্য সত্যই পাহাড় দেখিলাম, বাড়ীর অনতিদূরেই শালবনের হরিৎ রেখা দেখিতে পাইলাম, এবং

পার্ব্বত্য নির্ঝরের উল্লাসময়ী ক্রীড়া দৃষ্টিগোচর করিলাম, সেইদিন হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও সেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গৃহে পদার্পণ করিয়াই ছুটিয়া আমি পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম; উল্লাসে, ভয়ে, কৌতুহলে কিয়দ্দূর উঠিয়া, একটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে একবার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া লইয়াছিলাম। নিম্নোন্নত ভূমি, বৃহৎ অজগরের ন্যায় পার্ব্বত্য নদী, মেঘমালার ন্যায় দূরবর্ত্তিনী শৈলশ্রেণী, বনাচ্ছন্ন প্রদেশ, নির্জ্জন মনোরম প্রান্তর ও আম্রকাননের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সকল, চিত্রিত দৃশ্যপটের ন্যায়, আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের ভীষণ-গম্ভীর মূর্ত্তি, সেই স্থলের নির্জ্জনতা ও প্রকৃতির নীরবতা আমার বালক-হৃদয়ে ভীতিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত ছুটাইয়া দিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে যেন যাদুমন্ত্রবলে আমার কল্পনাদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, চিত্তবৃত্তি যেন মার্জ্জিত ও বিকশিত হইয়াছিল এবং হৃদয়ও যেন প্রশস্ততা লাভ করিয়াছিল। সেই দিন আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটী মহাদিন। সেই দিন হইতে আমি জীবনে এক অভিনব পরিবর্ত্তন অনুভব করি এবং এক দিব্য পবিত্র আনন্দের অধিকারী হইতে সমর্থ হই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই দিনের কথা আমার স্মৃতিপটে সমভাবে জাজ্বল্যমান থাকিবে।

দেবীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। স্বদেশে থাকিবার কালে আমি বিদ্যাশিক্ষায় তত মনোনিবেশ করি নাই; কিন্তু এই নূতন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আমার অনুরাগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বাল-সুলভ চাঞ্চল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিয়া আমি গম্ভীর-স্বভাব ও সংযতচিত্ত হইলাম। বিদ্যালয়ের পাঠাদি প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ অবসর

পাইলেই, আমি কখনও একাকী এবং কখনও বা কতিপয় বিশিষ্ট সহচরের সহিত পর্ব্বতের সন্নিকটে কিম্বা বনের ধারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; অথবা কখন কখন নির্দ্দোষ ক্রীড়াতেও মত্ত হইয়া আনন্দলাভ করিতাম।

কিন্তু সহচরগণের সহিত অবস্থান বা ভ্রমণ অপেক্ষা আমি নির্জ্জনতারই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলাম। প্রায় প্রত্যহই দিবাবসান কালে, আমি পর্ব্বতের উপর একাকী বসিয়া থাকিতাম। গ্রামের কোলাহল সেখানে পৌঁছিত না, এবং সেই উচ্চ স্থানের বায়ু নির্ম্মল, শীতল ও সুখসেব্য বোধ হইত। সেই স্থানে উপবেশন করিয়া আমি প্রায়ই সূর্য্যদেবকে অস্তাচলে গমন করিতে দেখিতাম। তাঁহার কনক-কিরণ-মালা বৃক্ষপত্রে, পর্ব্বতশিখরে, হরিৎক্ষেত্রে ও দূরস্থিত গিরিগাত্রে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। ক্রমে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া ধরাতলে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইত; পশুপক্ষী নীরব হইত; বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইত; কেবল মধ্যে মধ্যে গৃহমুখী রাখাল বালকের সঙ্গীত ও দলভ্রষ্ট দুই একটী গোমহিষের কণ্ঠ-বিলম্বিত-ঘণ্টা-ধ্বনি ব্যতীত আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইত না। আমি সেই সময়ে সেই পর্ব্বত-স্কন্ধে উপবেশন করিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে নিমগ্ন হইতাম, হৃদয়ে কত অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতাম, এবং তাহাদের অতৃপ্তির জন্য বিষণ্ণ হইয়া গৃহমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। এইরূপে পশ্চিম-বঙ্গে আমার জীবনের কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে সেই বিদ্যালয়ে আমার পাঠ-কাল সমাপ্ত হইয়া আসিল। পরিশেষে, কৈশোরের অন্তে ও যৌবনের প্রারম্ভে আমি উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য কলিকাতা মহানগরীতে উপনীত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া এক অভিনব রাজ্যে পড়িলাম। কলিকাতা নগরীর শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জনতা, কোলাহল কিয়দ্দিন আমার মনোরাজ্য সম্পূর্ণ-রূপে অধিকার করিয়া রহিল। ততদিন মনে আর কোন বিষয়ই স্থান পাইত না। ক্রমে কৌতূহল অনেকটা চরিতার্থ হইয়া আসিলে, অর্থাৎ কলিকাতা নগরীর অভিনবত্ব তিরোহিত হইবার উপক্রম হইলে, জন-কোলাহল আমার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে আমোদ প্রমোদে দুই চারি দিবস অতিবাহিত করিবার পর, দরিদ্র ব্যক্তি আপনার শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের জন্য যেরূপ লালায়িত হয়, কলিকাতা নগরীর বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে কিয়দ্দিন থাকিতে থাকিতে, আমিও তৎপ্রতি বীতরাগ হইয়া, পশ্চিম-বঙ্গের সেই আড়ম্বর-শূন্য নৈস-র্গিক শোভার জন্য তদ্রূপ ব্যাকুল হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিলাম; কলেজের বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া

আমার কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। সুতরাং আমি উপায়াভাবে, অবসর-কালে, একমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইয়া, কলিকাতা নগরীর সেই কোলাহলপূর্ণ রাজপথেই ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, জনহীন আরণ্যপথে, প্রান্তরে ও কৃষক-গ্রামে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতাম এবং মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। সুখময়ী কল্পনার প্রসাদে নগরীর কোলাহল আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না এবং জনতা আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইত না; যেন যাদুমন্ত্রবলে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কোলাহলময়ী নগরী প্রশান্ত বনাচ্ছন্ন প্রদেশে পরিণত হইয়া যাইত, এবং আমিও যেন দুই একটী আরণ্য কপোতের কূজন ও অজ্ঞাতনামা পক্ষীর মধুময় কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইতাম না! কলিকাতায় অবস্থান কালে, আমি মধ্যে মধ্যে এইরূপ স্বপ্নের আবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতাম।

স্বপ্নশীল ছিলাম বলিয়া, আমি কাহারও সহিত মিলিতে মিশিতে বড় একটা ভাল বাসিতাম না। আমার সমবয়স্ক সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেরই অন্য প্রকার প্রকৃতি ছিল। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বা আলাপ করিয়া আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না। তাহাদের ও আমার রুচি, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিতে আকাশ পাতালের প্রভেদ ছিল। সুতরাং আমি তাহাদের সহবাস হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই যার পর নাই আনন্দিত হইতাম। প্রয়োজন ব্যতীত আমি কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতাম না। এই কারণে আমার সহপাঠীরাও আমার সহিত মিলিতে মিশিতে আদৌ ইচ্ছা প্রকাশ করিত না। তাহারা আমাকে অহঙ্কৃত, অসামাজিক ও পল্লীগ্রামবাসী বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিত। অবশ্য আমার সাক্ষাতে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। সাক্ষাতে সম্মানেরই সহিত সকলে কথাবার্ত্তা কহিত; কিন্তু শুনিয়াছি, অসাক্ষাতে

আমার অদ্ভুত প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহারা বিলক্ষণ আমোদ সম্ভোগ করিত। আমি তাহাদের সম্মান বা বিরাগে অবিচলিত থাকিতাম। আমি কেবল জ্ঞানসঞ্চয়েই নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতাম এবং অবসরকালে কল্পনাকে সঙ্গিনী করিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিতাম।

কলেজে কিয়দ্দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে একটী সহপাঠীর প্রতি আমার হৃদয় বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়। উদ্ধতস্বভাব চপলচিত্ত সহপাঠি-বৃন্দের মধ্যে কেবল সেই যুবকটিকেই শান্ত, শিষ্ট ও সরলপ্রকৃতি দেখিতে পাইতাম। তাহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল; দৃষ্টি সরল, স্নিগ্ধ, কোমল ও প্রসন্ন—যেন তদ্দ্বারা তাহার হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি আপনা আপনিই প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। সেই যুবকটিকে দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা হইত; কিন্তু অনেকবার আলাপ করিব মনে করিয়াও তাহার সহিত আলাপ করিতে পারি নাই। একদিন কলেজের ছুটীর পর আবাসে প্রত্যাগত হইবার কালে, ঘটনাক্রমে দুইজনে পথিমধ্যে একত্র হইলাম। দুই একটী কথা কহিয়াই যুবকটীর হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। যুবকটীও সহপাঠীদের মধ্যে কাহারও সহিত পবিত্র বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। আমি যেরূপ তাঁহার সহিত, তিনিও সেইরূপ আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া এতাবৎকাল ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহসী হন নাই। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিলাম; বলিলাম "এখন আর শঙ্কার কোনও কারণ নাই। বাহ্যপ্রকৃতি স্বভাবতঃই সুন্দর। কিন্তু আকাশে সূর্য্য না থাকিলে, তাহার সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য ও বিষাদেরই ছায়া আসিয়া পড়ে। সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি কেমন প্রফুল্ল হয়; তাহার শত সৌন্দর্য্য চারিদিকে কেমন উছলিয়া পড়ে! আশা করি আপনিও

আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইবেন।” সেইদিন হইতে সত্যেন্দ্র ও আমি অভিন্নহৃদয় হইলাম।

সত্যেন্দ্রের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জগতে তাহার তুলনা নাই। স্বর্গীয় সদ্ভাব-কুসুম-নিচয়ে তাহা উল্লসিত ; তাহাদের দিব্য সৌরভে তাহা পরিপূরিত এবং এক স্নিগ্ধ, শুভ্র, অলৌকিক জ্যোতিঃতে তাহা উদ্ভাসিত। সত্যেন্দ্রের হৃদয় যে কি অপূর্ব্ব উপাদানে গঠিত, তাহা বলিতে পারি না। তাহাকে যতই জানিতে লাগিলাম, তাহার হৃদয়ের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সত্যেন্দ্রকে দেবকুমার বলিয়া মধ্যে মধ্যে আমার ভ্রম হইত। মানবসন্তানকে তো কখনও আমি এরূপ পবিত্র ও সুন্দর হইতে দেখি নাই। ঋষিকুমারেরা বুঝি এইরূপই ছিলেন। সত্যেন্দ্র বুঝি শাপভ্রষ্ট হইয়া মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! সত্যেন্দ্রের দেহ, মন, আত্মা সমস্তই বুঝি একই উপাদানে গঠিত! অহো, সত্যেন্দ্র আমার মনে যে আলোক আনিয়া দিল, তাহাতে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া গেলাম। সত্যেন্দ্র সত্য সত্যই আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইল।

কি শুভক্ষণেই আমি সত্যেন্দ্রের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম! মহেন্দ্র ক্ষণ কাহাকে বলে জানি না। কিন্তু এই মহাক্ষণেই আমাদের বন্ধুতাসূত্র গ্রথিত হইয়া থাকিবে। এরূপ বন্ধু ও এরূপ মিলন জগতে অল্পই হইয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অবধি আমি আর একাকী ভ্রমণ করিতাম না। সমস্ত দিন মহোৎসাহে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া, আমরা উভয়ে বৈকালে ভ্রমণের সময় ব্যাকুলহৃদয়ে একত্র হইতাম। তখন আমরা উভয়ে একমন, একপ্রাণ, একহৃদয়। তখন আমাদের এক চিন্তা,

এক আকাঙ্ক্ষা, এক চেষ্টা। তখন আমাদের উৎসাহের সীমা নাই, আনন্দের শেষ নাই। বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা আগ্রহান্বিত হইলাম, এবং সচ্চিন্তা সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠে আমরা এক অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সহপাঠিবর্গ আমাদের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। কেহ কেহ আমাদের ঈর্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু অনেকেই আমাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। সত্যেন্দ্রের ও আমার পরীক্ষার ফল আশাতীতরূপে সন্তোষজনক হইতে লাগিল। অধ্যাপকেরা আমাদিগকে যার পর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সত্যেন্দ্র আমার ও আমিও সত্যেন্দ্রের উন্নতিতে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রকে আমি আমার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিতাম; সত্যেন্দ্রও আমাকে তাহার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিত। সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর আমার অন্তর্ব্বাহ্য যেরূপ জানেন, সত্যও আমার অন্তর্ব্বাহ্য সেইরূপ জানিত। তাহার নিকট আমার গুপ্ত বা গোপনীয় কিছুই ছিল না। তাহার নিকটে কিছু গোপন করাকে আমি পাপ মনে করিতাম। যদি কখনও কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে মনে কোন মতেই শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতাম না। সত্যেন্দ্রও তাহার প্রাণের সকল কথা আমাকে বলিত। এইরূপে আমরা উভয়ে পরস্পরকে জানিতাম। পরস্পরের শক্তি, গুণ, ও দৌর্ব্বল্য পরস্পরের অবিদিত ছিল না। এই পারস্পরিক জ্ঞানের জন্য আমরা নিয়তই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম। পরস্পরের যত্ন ও চেষ্টায় আমরা আমাদের স্বভাবগত দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুণের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রাণের মিলন যাহাকে বলে, সত্যের ও আমার তাহা হইয়াছিল। আমি যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একান্ত অনুরাগী, সত্য তাহা জানিত। ফলফুল, লতা পাতা, বন জঙ্গল পাহাড় আমি যে অতিশয় ভালবাসি, সত্যের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সত্য কখন পাহাড় পর্ব্বত দেখে নাই, সুতরাং সে আমার নিকট তাহাদের বর্ণনা শুনিতে যার পর নাই কৌতূহল প্রকাশ করিত। গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশের সময় আমি পশ্চিম-বঙ্গে জনক জননীর নিকট অবস্থান করিতাম। সত্যকে ছাড়িয়া সেই কতিপয় মাস অতিবাহিত করা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইলেও, কেবল একমাত্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসাতেই আমি সেখানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। কিন্তু সেখানে যাইয়া পূর্ব্বের মত আর আনন্দলাভ করিতাম না। সেই পাহাড়, সেই জঙ্গল, সেই নদী, সেই খাল সমস্তই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু আমার প্রাণের একটা স্থল যেন শূন্য পড়িয়া থাকিত; কিছুতেই আর তাহা পূর্ণ হইত না। তখন আমার বড় কষ্ট হইত; তখন ভাবিতাম, সত্য যদি নিকটে থাকিত, তাহা হইলে, আজ প্রাণের মধ্যে এই অপূর্ণতা কখনই অনুভব করিতাম না। তখন বুঝিতে লাগিলাম, সত্যের সহিত কোনও সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিলে, তাহার আর মাধুর্য্য থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য সত্যকে আমি অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্ত্বেও, সত্য একবারও আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার এই অসামর্থ্যের কতিপয় কারণও বিদ্যমান ছিল। সত্য বাল্যকাল হইতেই জনকজননীহীন; সত্যের পিতার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল; তাহার যেরূপ আয় ছিল, তাহাতে একটী পরিবারের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ হইতে পারে। কলেজের ছুটী হইলেই, সত্য আপনার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে যাইত।

প্রধানতঃ এই কারণেই, (অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া কেবল একমাত্র ভ্রমণজনিত আনন্দ-সম্ভোগের জন্য), আমি তাহাকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে বড় একটা অনুরোধ করিতাম না। আর একটী কারণেও সত্য কলেজের অবকাশের সময় অন্য কোথাও যাইতে পারিত না। সত্যেন্দ্রের এক পিতৃষসা ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সত্যের মরুময় জীবনে করুণাময়ী পিতৃষসাই স্বর্গীয় স্নেহের একমাত্র নিস্যন্দিনী ছিলেন। তাঁহার পবিত্র স্নেহসেচনে সত্যের শোকসন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইত। সুতরাং কলেজের অবকাশ হইলেই সত্য পিতৃষসার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইত। এই কারণেও আমি সত্যকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়া তাহার সুখের এই সামান্য পরিমাণের আর হ্রাস করিতে চাহিতাম না। সত্য পৈত্রিক আবাসে বিষয়কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে পিতৃষসার গৃহে গমন করিত। সেই গ্রামে তাহার পিতার জনৈক বন্ধুও বাস করিতেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রীও সত্যকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। একবার পূজাবকাশের সময়, আমি সত্যের ও তাহার পিতৃষসার সবিশেষ অনুরোধক্রমে সত্যের সহিত সেখানে গমন করিয়াছিলাম। সত্যের পিতৃবন্ধু হরনাথ বাবুর সহিতও সেই উপলক্ষে আমি পরিচিত হই। তিনি অতিশয় মহাশয় ব্যক্তি। তিনি ধনশালী, শিক্ষিত ও উদারচরিত্র। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কোনও সন্তান ছিল না। কন্যাটীর নাম সুরমা। তখন তাহার বয়ঃক্রম দশ বা একাদশ বর্ষ ছিল। কন্যার তখনও বিবাহ হয় নাই। হরনাথ বাবু এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কন্যার প্রতি অত্যধিক স্নেহই তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পের প্রধান কারণ ছিল। বিবাহ হইলে, কন্যা পরের হইবে এবং পরগৃহে যাইবে, এই চিন্তায় হরনাথ বাবু

ও তাঁহার স্ত্রী কন্যার বিবাহ আরও দুই এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন; সুতরাং কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলেন। কন্যার এই নির্ব্বাচিত পাত্র আর কেহই নহে—আমার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ।

হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর এই সঙ্কল্পের কথা সত্য ও সত্যের পিতৃষসা ব্যতীত আর কেহ জানিতেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমি সত্যের নিকটে যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, সুরমা তাহা জানিত না। পিতামাতা সুরমার বিবাহের কথা তাহার সমক্ষে কখনও উত্থাপিত করিতেন না। আর সুরমাকে যেরূপ সরলা ও পবিত্রস্বভাবা দেখিলাম, তাহাতে তাহার মনে বিবাহের চিন্তা কখনও যে উদিত হইয়াছে, তাহা বোধ হইল না। আমরা হরনাথ বাবুর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে কেহ নাই। হরনাথ বাবু কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, এই মনে করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম, বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে একটী সুন্দরী বালিকা এক শেফালিকা বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া একমনে পুষ্পসংগ্রহ করিতেছে। সত্য তাহাকে দেখিবামাত্র ডাকিল, "সুরমা"। সুরমা চকিতার ন্যায় একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া, সত্যকে দেখিবামাত্র আনন্দধ্বনি করিতে করিতে, তাহার দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমাকে দেখিয়া সহসা স্থির হইল এবং "সতু দাদা, যেও না; বাবাকে ডেকে আনি" এই বলিয়া ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই, হরনাথ বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্ত অবলম্বন করিয়া আনন্দ ও উল্লাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সুরমাও আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য হরনাথ বাবুর

সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছে, ইত্যবসরে সুরমা সত্যের হাত টানিয়া আব্‌দারের স্বরে বলিতে লাগিল "সতুদাদা, বাড়ীর ভেতর একবার এস না, মা তোমায় ডাক্‌চেন।" কন্যার আগ্রহ দেখিয়া হরনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন "সতু, সুরমার জিদ্‌ দেখ্‌চো না, আগে তুমি বাড়ীর ভেতর থেকেই হ'য়ে এস; আমি তত-ক্ষণ দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই।" এই বলিয়া, তিনি আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন।

সুরমাকে এই প্রথম দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলাম। সত্য সুরমার সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিল। সুরমা সত্যকে কখন কখন পত্রও লিখিত। সেই পত্রগুলিও আমি দেখিয়াছিলাম। বন্ধুর বর্ণনে ও সেই পত্রগুলিতে আমি সুরমার সরল পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং মনে মনে তাহার একটী চিত্রও আঁকিয়া লইয়াছিলাম। এক্ষণে স্বচক্ষে সুরমাকে দেখিয়া বুঝিলাম, আমার কাল্পনিক চিত্র জীবন্ত চিত্রেরই অনুরূপ বটে।

হরনাথ বাবুর সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে সত্য সুরমার সহিত অন্তঃপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরনাথ বাবু সত্যকে দেখিয়া বলিলেন "সতু, তুমি সুরমাকে যে বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা ও কতদূর পড়েচে, দেখ্‌লে?" সুরমা পিতার কথা শুনি-য়াই বলিয়া উঠিল "আমি বইখানি আগাগোড়া পড়েচি। মাকে আমি সীতা সাবিত্রীর কথা অনেকবার পড়ে শুনিয়েচি।" এই বলিয়া সুরমা তদ্দণ্ডেই অন্তঃপুর হইতে তাহার উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকখানি আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকা আসিয়াই স্ফূর্ত্তির সহিত বলিতে লাগিল "এতগুলি গল্পের মধ্যে সীতা ও সাবিত্রীর গল্পই আমার বড় ভাল

লেগেছে। মা ব'লছিলেন, যমকে কেউ বশীভূত কর্‌তে পারে না;
কিন্তু সাবিত্রী খুব ভাল মেয়ে ছিল বলেই, যম তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিয়ে-
ছিলেন। হাঁ সতুদাদা, সাবিত্রী কি খুবই ভাল মেয়ে ছিল? আচ্ছা,
ভাল মেয়ে কেমন ক'রে হ'তে হয়, কই, বইয়ে তো তা লেখা নেই?''
বালিকার আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা দেখিয়া আমরা সকলেই বড় আনন্দিত
হইলাম। আমি ভাবিলাম, সুরমা যদি কখনও আমার বন্ধুর জীবনের
সঙ্গিনী হয়, তাহা হইলে, তাহারা উভয়েই যথার্থতঃ সুখী হইবে।
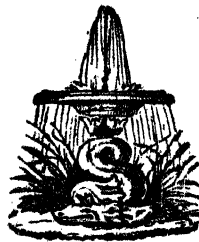
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সত্যকে একবারও পশ্চিমবঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলাম না। পূজাবকাশ ও সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশগুলি আমাকে একাকীই সেখানে কাটাইতে হইত। কিন্তু সত্য ব্যতীত আমার আর কিছুই ভাল লাগিত না। সত্যকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলাম বলিয়াই, আমার হৃদয়ে এই অশান্তি ও অপূর্ণতার উৎপত্তি হয়। সত্যের একখানি চিঠির জন্য সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে চিঠি না পাইলে, অস্থির হইতাম। মনের প্রসন্নতা কোথায় চলিয়া যাইত; আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, পাঠে, আলাপে কিছুতেই সুখ ও পরিতৃপ্তি পাইতাম না। মানুষের সহবাস আমি বিষবৎ পরিহার করিতাম। এইরূপ সময়ে আমি নির্জ্জনতাই অধিকতর ভাল বাসিতাম। প্রভাতে বনের ধারে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; সন্ধ্যার প্রাক্কালে, পর্ব্বতের নিম্নদেশে একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া, আকাশ পাতাল চিন্তা করিতাম। সত্যেন্দ্রের অভাবে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। একখানি চিঠি পাইলেই, এই

যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইতে পারিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অভি-লষিত চিঠিখানিও যথাসময়ে আসিত না। সত্যেন্দ্রের উপর এক একবার রাগ ও অভিমান করিতাম; কিন্তু আবার ভাবিতাম "সত্যেন্দ্রের যদি অসুখ হইয়া থাকে!" এই ভাবনা উপস্থিত হইলেই, রাগ অভিমান কোথায় পলাইয়া যাইত। আমি তাড়াতাড়ি সত্যেন্দ্রকে চিঠি লিখিতে বসিতাম; চিঠিতে রাগ অভিমানের ছায়া মাত্র থাকিত না; সত্যেন্দ্র কেমন আছে, তাহাই জানিবার জন্য কেবল ব্যাকুলতামাত্র প্রকাশিত করিতাম।

এইরূপ সত্যের একখানি চিঠির অভাবে আমি কখন বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইতাম; আবার অন্য সময়ে তাহার কায়িক ও মানসিক কুশল-সংবাদ-সম্বলিত একখানি পত্র পাইলেই যার পর নাই হৃষ্ট হইতাম। কিন্তু হর্ষের পর বিষাদ ও বিষাদের পর হর্ষের এই পর্য্যায় দেখিয়া, সুখ জিনিষ-টার উপর ক্রমশঃ আমার শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে লাগিল। সুখ জিনিষটা আমার নিকট একটা অস্থির, চঞ্চল, ও অস্থায়ী পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; দেখিলাম, ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু প্রাণ সুখেরই জন্য লালায়িত। "কোথায় সুখ," "কোথায় সুখ," প্রাণের ভিতর হইতে নিয়ত কেবল এই এক ধ্বনিই উত্থিত হইতেছে। সংসারে যে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আমি সন্দিহান হইতে লাগিলাম। আমি পিতামাতাকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করি, ভালবাসি; আমার উপর তাঁহাদের কত স্নেহ ও দয়া। কিন্তু হায়, ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে, হয়ত এই স্বর্গীয় স্নেহ-সুখ হইতে হতভাগ্য আমাকে একদিন বঞ্চিত হইতে হইবে। সত্যকে কত ভাল বাসি; সত্যকে ভাল বাসিয়া কত সুখ। কিন্তু হায়, দেখিলাম, এ সুখসাগরেও বিলক্ষণ জোয়ার ভাটা আছে। বিবাহের চিন্তাকে মনের মধ্যে বড় একটা স্থান দান করিতাম না; কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধটা যে আমা-

দের পবিত্র বন্ধুত্বেরই ন্যায় একটা জিনিষ হইবে, তাহা অনুমান করিয়া লইতাম। সুতরাং সে সুখের উপরেও নির্ভর করিতে ইচ্ছা হইত না। পিতামাতাকে ও বন্ধুকে হারাইবার যেরূপ ভয়, স্ত্রীকে এবং পুত্রকন্যা-দিগকেও তো হারাইবার সেইরূপ ভয় আছে! তবে বিবাহ করিয়াই বা সুখ কি? অস্থির, ক্ষণিক সুখের প্রতি আমার কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল।

সত্য ও আমি এই সময়ে এম্‌-এ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম এই সময়ে প্রায় একবিংশ বৎসর হইয়াছিল। আমরা উভয়েই বিশিষ্ট সম্মান ও যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় সফলযত্ন হইয়াছিলাম। যতদিন পাঠে নিবিষ্ট ছিলাম, ততদিন সংসারকে বড়ই সুন্দর ও সুখময় স্থান মনে করিতাম। এ হেন সংসারে প্রবেশ করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি অনেকবার আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মোহাঞ্জন খসিবার উপক্রম হইতেছিল; সংসারের প্রকৃত ছবি অল্পে অল্পে আমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাতে সংসার-প্রবেশের ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, দ্বার হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। সংসারে যদি প্রকৃত সুখ পাওয়া না যায়, সংসারে প্রবেশ করিয়া লাভ কি? যদি সংসারে প্রাণের পূর্ণ-তৃপ্তি না হয়, তবে সংসারে প্রয়োজন কি?

এই গভীর প্রশ্নে আমার মনঃপ্রাণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। লোকের সহবাসে থাকিয়া এই প্রশ্নের সন্তোষকর মীমাংসার সম্ভাবনা দেখিতাম না; আই নির্জ্জনে অবস্থান করিতাম। মুখমণ্ডল বোধ হয় চিন্তাভারাক্রান্ত দেখাইত। নতুবা যে দেখিত, সেই আমাকে আমার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত কেন? পরীক্ষায়

অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছি, ইহাতে আমার আনন্দিত হইবারই কথা; আনন্দিত না হইয়া আমি সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ থাকি কেন? কেহই আমার এই অপূর্ব্ব ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা অনেক আন্দোলন আলোচনার পর এ সম্বন্ধে একটা সুচারু সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে আমার পিতাঠাকুর মহাশয় ও জননীদেবী তাঁহাদের যথেষ্ট নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনতিবিলম্বে আমার জন্য একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

জননীদেবী অতিশয় সরলহৃদয়া। তিনি আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিয়তই আমার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি পেট ভরিয়া খাই না কেন, উদাসীনের মত নির্জ্জনে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াই কেন, বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আলাপ বা আমোদে প্রবৃত্ত হই না কেন, দেবতা ও উপদেবতাদের বিহারস্থল পাহাড়পর্ব্বতে একাকী আরোহণ করি কেন, বনের ধারেই বা বেড়াইতে এত আগ্রহ প্রকাশ করি কেন,—এইরূপ তিরস্কারমিশ্রিত নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার বিষাদের কারণ অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন। আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব, ঠিক্ করিতে পারিতাম না। অনেক দিন সতুর চিঠি পাই নাই, পাহাড়ে উঠিতে আমার বড় আনন্দ হয়, বয়স্যগণের সহিত আলাপ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না,—সময়ে সময়ে আমি তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিতাম। কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম, আমার উত্তরগুলি তাঁহার নিকটে যেন সন্তোষজনক বোধ হইত না। আমি যে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি, অবশ্য সে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন নাই। বিবাহের নাম শুনিলে আমি যে অত্যন্ত বিরক্ত হই, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই কারণে, আমার

সাক্ষাতে বিবাহের কথা কখনও তুলিতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল যে, অতঃপর আমার বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তাঁহার ভয় হইয়াছিল, আমাকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে, হয়ত আমি উদাসীন হইয়া যাইব। বলা বাহুল্য, প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা এই ধারণাটীকে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে বিলক্ষণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমার বিবাহের প্রস্তাবের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত ও জীবনোপায় স্থিরীকৃত না করিয়া বিবাহ করিতে কখনই সম্মত হইব না, ইহা পিতৃদেব, জননী ও বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিতেন। পিতাঠাকুর মহাশয় এই কারণেই এতদিন আমার বিবাহের নিমিত্ত তাদৃশ উদ্যোগী ছিলেন না। এক্ষণে আমার বিবাহের চিন্তায় অপর দশজনের নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত ও শিরোবেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি বাধ্য হইয়া, লোকলজ্জার খাতিরে, আমার জন্য একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বয়স্যগণের নিকট আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম। শুনিয়া আমার হৃদয়ে দুঃখ, অভিমান, বিরক্তি ও হাস্যরসের বিচিত্র সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব লীলা আরম্ভ হইল। কিন্তু হায়, আমার হৃদয়ের গভীর অশান্তির কারণ কেহই অবগত হইল না। কাহাকেও তাহা বলিলামও না। যাহাকে তাহাকে তাহা বলিয়াই বা কি ফল হইবে? কেই বা তাহা বুঝিবে? বুঝিলেই বা কে আমার সংশয়-জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে? একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ আমার অশান্তির কারণ জানিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বুঝিলাম, সেই মহাপুরুষ ভিন্ন এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপরে ধীরে ধীরে নির্ভর করিতে লাগিলাম।

আমার বিষাদের এই প্রগাঢ় ছায়া সত্যের প্রসন্ন হৃদয়কেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সত্য স্বভাবতঃই আমাকে গম্ভীর বলিয়া জানিত; কিন্তু গম্ভীর হইলেও, আমার যে আত্মপ্রসাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। এইবার পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়া আমি হৃদয়ে যে গুরুতর প্রশ্নের আন্দোলন অনুভব করিলাম, তাহার দুই একটী তরঙ্গ তাহার হৃদয়কেও অভিঘাত করিয়াছিল। সত্য আমাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে সকল কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছিল। আমার হৃদয় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের জন্য যে কিরূপ লালায়িত, তাহা তাহাকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যতৃষা জগতের কোন পদার্থেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না, হইবারও নহে। জগতের প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, জগতের সৌন্দর্য্যে অপূর্ণতা আছে। প্রাণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। তাই হৃদয়ের আবেগে তাহাকে লিখিয়াছিলাম "আমি এই জগতের কোনও পরিমিত রূপে বা সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইতে চাই না; তাহাতে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে চাই না। আমি চাই ডুবিতে এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাগরে; আমি চাই তন্মধ্যে আত্মহারা হইতে, তন্মধ্যে মিলিয়া যাইতে। সেই রূপসাগরে, সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরে না ডুবিতে পারিলে কি আমার তৃপ্তি জন্মিবে? জীবনে শান্তি পাইব? যেখানে সমস্ত সৌন্দর্য্য মিলিয়া গিয়াছে, যেখানে সমস্ত পবিত্রতা একত্রীভূত হইয়াছে, হায়, কবে আমি সেই স্থানে যাইব, কবে আমি তাহা দেখিয়া চরিতার্থ হইব? আহা, কি শান্তির নিলয় তাহা! কি অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডার তাহা! সে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, সে আনন্দে শঙ্কা নাই, সে সম্ভোগে বিলাস নাই। জগদীশ, কবে আমায় সেই স্থানে লইয়া যাইবে?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিমবঙ্গ আর ভাল লাগিল না। আমার বিষাদরোগের প্রতীকার করিতে সকলেই উদ্যুক্ত; কিন্তু অবিচক্ষণ বৈদ্যের ন্যায় কেহই আমার রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। চারিদিকেই বিবাহের কথা শুনিতে শুনিতে প্রাণে বিরক্তি জন্মিল। নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ, উপত্যকা, কোন স্থানেই আর সুখ পাইলাম না। গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিবার সময় উপস্থিত হইল। ব্যবহারশাস্ত্র পাঠ করিতে আমায় কলিকাতায় যাইতে হইবে;—সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে ভ্রমণ করিয়া বরং শান্তি ও নির্জ্জনতা অনুভব করিতে লাগিলাম। সত্য আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল; সুতরাং সে আমার মনে শান্তি আনয়নের জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। আমি সত্যের সহবাসে অনেকটা আশ্বস্ত হইতাম বটে; কিন্তু প্রাণের ভিতর অশান্তির ছায়া লুক্কায়িত থাকিত।

সত্য এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইল। আমি আইন পড়িতে লাগিলাম। কেন আইন পড়িতেছি, আইন পড়িয়া কি করিব, তাহা ভাবিলাম না। আইন পড়িতে হয়, তাই পড়িতে লাগিলাম। প্রত্যহ কলেজে যাইতাম, কিন্তু সেখানে কি বিষয় পঠিত হইতেছে, তাহার বড় একটা সংবাদ রাখিতাম না। অধ্যাপক আসিয়া যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন, তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। আইনের নীরস ব্যাখ্যাগুলি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না। মন তখন কলেজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিত; আমিও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, সহপাঠীরা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোন দিকেই আমার লক্ষ্য থাকিত না। অধ্যাপক মহাশয় কখন কখন পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোনও অদ্ভুত প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেন; সহপাঠীরা প্রায় সকলেই তাহাতে যোগদান করিত। তাহাদের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কখন কখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত; আমি চকিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিতাম এবং হাস্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া, অপ্রতিভের ন্যায়, মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি প্রায়শঃ সকলের পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করিতাম। সহপাঠিবর্গের মধ্যে কেহই একটী দিনও আমাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করে নাই, ইহা তাহাদের সবিশেষ উদারতারই পরিচয়, সন্দেহ নাই।

দিনের মধ্যে কেবল এক ঘণ্টার জন্য আমাকে কলেজে যাইতে হইত। সেই ঘণ্টাটি অতিবাহিত করিয়া আমি প্রায় সমস্ত দিনই বাসায় থাকিতাম। সত্যেন্দ্র বৈকালে কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইলে,

কিয়ৎক্ষণের জন্ম তাহার সহিত মিলিত হইতাম। অন্যান্য সময়ে বাসায় বসিয়া কেবল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতাম। আমার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অবশ্য ব্যবহারশাস্ত্র ছিল না। তবে আমি কি কি বিষয় পাঠ করিতাম? সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে দুইটী ব্যক্তির রচনা আমার প্রাণস্পর্শ করিত। ইংরাজীতে কবিবর ওয়ার্ডস্বয়ার্থ, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে কবি-গুরু মহর্ষি বাল্মীকি। উভয়েরই মর্ম্মস্পর্শিনী রচনায় আমার ভাবসাগর উথলিয়া উঠিত। উভয়েরই নির্ম্মল পবিত্রজীবন, উভয়েরই ধর্ম্মভাব, উভয়েরই পূর্ণ আদর্শের জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং উভয়েরই বাল-সুলভ সরলতা আমার হৃদয়-মন মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্বয়ার্থের তুলনা করিতেছি না; বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্ব-য়ার্থ কেন, জগতের কোন কবিরই তুলনা হয় না। কিন্তু তুলনা না হইলেও, বাল্মীকি ও ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি উভয়কে একই লক্ষ্যস্থলের যাত্রী স্থির করিয়াছিলাম। উভয়েরই লক্ষ্য পূর্ণ আদর্শ, পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ পবিত্রতা। উভয়েরই একমাত্র সাধ্য ও আরাধ্য বস্ত—সেই সত্য, সুন্দর, এক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ; তাই উভয়েরই নিকটে আদর্শ কবি—সেই এক ও অদ্বিতীয় মহাকবি, যাঁহার অপূর্ব্ব রচনা এই অপূর্ব্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—সামান্য বৃক্ষপত্রে, তৃণদলে, বালুকাকণায় যাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বসুধা সহস্রধারায় উছলিয়া উঠিতেছে,—যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র ধারণা করিতে গিয়া হৃদয়-মন অভিভূত হইতেছে। তাই উভয়েই সেই মহাকবির অপূর্ব্ব রচনা পাঠ করিতে করিতে জীবনকে অতিবাহিত ও ধন্য করিয়াছেন, তাই উভয়েই নির্জ্জন অরণ্যে ও পর্ব্বতময় প্রদেশে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়াছেন এবং দিব্য আন-ন্দের অধিকারী হইয়া সার্থকজন্মা হইয়াছেন। বাল্মীকি তো মহর্ষিই ছিলেন; ওয়ার্ডস্বয়ার্থও ঋষিজনোচিত জীবন যাপন করিয়া এই পাপ-

যুগে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন। আমি উভয়েরই উপাসক হইলাম; উভয়েরই কাব্য পাঠ করিয়া হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সংশয়জাল ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। এক দিব্য জ্যোতিঃতে হৃদয়-মন পূর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, আমি এই মানবজীবন বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত হইতে দিব না; যে কার্য্যে আত্মা আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, সে কার্য্য প্রাণান্তেও করিব না। সংসারের ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য কোন কালেই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হইবে না। সেই জ্যোতির্ম্ময়ই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইবেন। আত্মার আনন্দের জন্য সকলই পরিত্যাগ করিব। সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার একমাত্র আধার সেই মহান্ পরমেশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সেবাতেই জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিব। আমার জীবনের লক্ষ্য এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে, আমি কিয়ৎপরিমাণে শান্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মা যে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাঁহার কৃপা লাভ করাই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। হৃদয়ঙ্গম হইল বটে, কিন্তু সংসারের কোলাহলে আমি মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। লক্ষ্যহীন হইলেই, সাংসারিকতা ধীরে ধীরে আমার মনটিকে অধিকার করিয়া বসিত। কিন্তু সংসারের আমোদ প্রমোদে আত্মা তৃপ্তি লাভ করিত না; সুতরাং আমিও প্রকৃত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইতাম। এইরূপ অবস্থায় আহারে, শয়নে, পাঠে, আলাপে, কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না এবং সহস্র চেষ্টাতেও মনকে নির্ম্মল ও সাংসারিকতাকে দূরীভূত করিতে পারিতাম না। মোহ যেন আমাকে জড়াইয়া থাকিত। কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইলে, কোন বস্তুই যেরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না, মোহাচ্ছন্ন হইয়াও আমি তদ্রূপ কোন বস্তুরই স্বরূপ দেখিতে পাইতাম না। মনে তখন বড় যন্ত্রণা হইত। যন্ত্রণা সময়ে সময়ে অসহ্য হইয়া পড়িত। তখন নির্জ্জনে বসিয়া কিম্বা

উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতাম এবং কাতর হৃদয়ে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়ের দুঃখভার যেন লঘু হইত, কুয়াসা যেন কাটিয়া যাইত, এবং প্রাণ যেন শান্তিরসে সিক্ত হইত। মেঘ-বৃষ্টি-ঝটিকা-বজ্রময় দুর্দ্দিনের শেষে, নির্ম্মল গগনে উজ্জ্বল প্রভাকরের প্রকাশে, ধরণী যেরূপ হাস্যময়ী হয়, প্রার্থনার পর আমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হৃদয়রাজ্যেরও সেইরূপ অবস্থা হইত। হৃদয়ের এই শান্ত, স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাবটির সংরক্ষার জন্য আমি নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতাম। কিন্তু কালক্রমে দেখিতে পাইলাম, প্রার্থনা বা ঈশ্বর-চিন্তাই ইহার একমাত্র উপায়। তদবধি প্রার্থনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম। যখনই হৃদয়ে অন্ধকার বা কুয়াসা আসিবার উপক্রম হইত, তখনই পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতে বসিতাম। পরমেশ্বরের কৃপাতে অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিত। প্রার্থনাই যে আত্মার একমাত্র জীবনীশক্তি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

ইহার পর আমার মনের অবস্থাও কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা তেমনই প্রবল রহিল বটে, কিন্তু মন প্রসন্ন ও পবিত্র না থাকিলে কিছুই ভাল লাগিত না। শুধু স্বভাবিক সৌন্দর্য্য কেন, এরূপ অবস্থায় বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ড-স্বয়ার্থের মধুময়ী কবিতারও কিছুমাত্র মাধুর্য্য থাকিত না। ভগবদুপাসনা দ্বারা মন পবিত্র ও হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে দিব্য সৌন্দর্য্য কিছুতেই প্রতিভাত হইত না। পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য দেখিলেই তাহাতে মুগ্ধ হইতাম, কিন্তু এখন আর সে প্রকার অবস্থা রহিল না। এখন যে কোন অবস্থায় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। আমি আবিলহৃদয়ে যখনই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তখনই আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রলয় ও হাহাকার

উঠিয়াছে। তখনই আমি কাহার জলদগম্ভীর রবে যেন স্তম্ভিত হইয়াছি। সেই রব শুনিলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, শরীর শিহরিয়া উঠিত, গণ্ডস্থল বহিয়া ঝর্ ঝর্ অশ্রু পড়িত ও সংসার যেন আমার চক্ষে অন্ধকারময় বোধ হইত। কিন্তু ভগবদুপাসনা দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে. বাহ্যপ্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি সহজেই উপভোগ করিতে পারিতাম. পরমেশ্বরের মহিমা ও কৃপা জলে, স্থলে ও শূন্যদেশে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতাম; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিত্বসুধা পান করিতে সমর্থ হইতাম; মহর্ষি বাল্মীকির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে মুগ্ধ হইতাম; তাঁহার ব্রহ্মঘোষ-নিনাদিত দণ্ডকারণ্যের প্রাণস্পর্শিনী শোভা ও পবিত্রতার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হইতাম এবং জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবী, ভগবান্ রামচন্দ্র ও মহাত্মা লক্ষ্মণের অলৌকিক চরিত্রের আলোচনা করিতে করিতে মানস-চক্ষে যেন স্বর্গরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া অবলোকন করিতাম। তখন হৃদয় প্রসারিত হইয়া যেন ব্রহ্মাণ্ডময় পরিব্যাপ্ত হইত; মোহমুগ্ধ মানবের অসার কোলাহলে প্রাণ ব্যথিত হইত, জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত; রাগ, দ্বেষ, অভিমান কোথায় লুক্কায়িত হইত; শত্রু-মিত্র-জ্ঞান থাকিত না এবং সকলকেই ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইত। তখন মনে করিতাম, সকলের দ্বারে দ্বারে আনন্দ ও শান্তির সমাচার আনয়ন করিব; সকলকে পবিত্র হইতে বলিব; সকলকে মহান্ পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিব। এইরূপ মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া, আমি মধ্যে মধ্যে স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যাইতাম, ক্ষুধাতৃষ্ণা অনুভব করিতাম না, হাতের পুস্তক হাতেই থাকিত, এবং কেহ নিকটে আসিলেও, তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না।

উপাসনা, সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠই এই সময়ে আমার

প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধু মহাত্মাদিগের গ্রন্থাদি-পাঠে আমি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতাম। অস্মদ্দেশীয় মহর্ষিগণোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ করিয়া আমি যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম, বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই নাই। মনঃপ্রাণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ের মহাভাবে যতক্ষণ নিমগ্ন থাকিত, ততক্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিত না। নির্ম্মল গগনে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ হইলে, দীপ্তিময়ী তারকারাজি যেরূপ আর চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, গীতা ও উপনিষদের মহাভাবে নিমগ্ন হইলে, বাল্মীকি বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতাও সেইরূপ আমার চিত্তবিনোদন করিতে পারিত না। কিন্তু অন্য সময়ে, অর্থাৎ আমি সংসারের কোলাহলময় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, ইঁহারাই আমার জীবনাকাশে সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় সুশোভিত হইতেন।

যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় আমি আমার জীবনের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইলাম। আমার লক্ষ্যও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। তদনুসারে আমি আমার কার্য্যাদি নিয়মিত করিতে প্রস্তুত হইলাম।
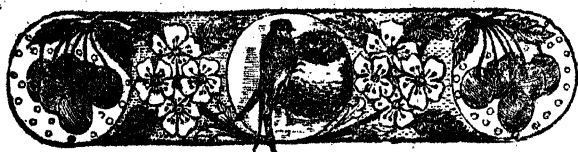
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরই যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলেন, তখন জীবনের কার্য্যসকলও একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আমি ব্যবহার-শাস্ত্র-পাঠ পরিত্যাগ করিলাম। ব্যবহারজীবী হইলে, অনেক সময় সত্যপথে চলিতে পারিব না, ইহাই আমার বিশ্বাস হইল। সত্যই পরমেশ্বর; সুতরাং পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বসময়ে নির্ম্মল সত্যেরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বাধীনতা না থাকিলে, সত্যের উপাসনা করা যায় না। এই কারণে স্বাধীনতা লাভের জন্যও ব্যাকুল হইলাম। স্বাধীনতার অর্থে, আমি মনের ও আত্মার স্বাধীনতার কথাই বলিতেছি। এই স্বাধীনতালাভের পথে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য পরের দাসত্বকেই আমি প্রধান অন্তরায় মনে করিলাম। এই কারণে স্থির করিলাম, কাহারও বর্ত্তনভোগী হইব না। তবে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব? আমার সংসার অর্থে কেবল আমাকেই বুঝাইত। পিতামাতাকে

আমার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হইত না। আমার অগ্রজ ভ্রাতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ-পদে নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকেও কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। আমিও বিবাহ করি নাই এবং সঙ্কল্প করিতেছিলাম, হয়ত বিবাহ করিবও না। সুতরাং আমার একমাত্র চিন্তা, কেবল আমারই প্রতিপালনের জন্য। পরমেশ্বরের কৃপায় তাহারও একপ্রকার উপায় হইয়া গেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটী পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কতিপয় সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইলাম। পিতৃদেবকে অনুরোধ করায় তিনি আমার জন্য সেই মুদ্রায় কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিলেন। সে ভূসম্পত্তির উপসত্ব বার্ষিক ছয় শত টাকা মাত্র। ইহাই আমার আয় নির্দ্দিষ্ট হইল। এই আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য, পিতৃদেব, জননী ও আমার অগ্রজ ভ্রাতারা আমার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে আমাকে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, তাঁহারা দুঃখিত মনে নিরস্ত হইলেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিলে আমিও যার পর নাই আনন্দিত হইতাম; কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্য কোনও উপায় না থাকাতে, আমি অগত্যা নিজ ইচ্ছামতই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলাম। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, পিতৃদেবকে আমি আমার অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জানাইয়াছিলাম; তিনি যেরূপ বিজ্ঞ, শিক্ষিত ও উদারচিত্ত, তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমাকে আর কোনও বাধা দিলেন না। কেবল জননী দেবীকেই কোনপ্রকারে বুঝাইতে পারিলাম না। আমি এখন বিবাহ করিব না এবং অপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় কোনও উচ্চপদে আরোহণের

চেষ্টা করিব না, ইহা অবগত হইয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমি যে উদাসীন হইয়া যাইব, এই বিশ্বাসটি তাঁহার মন হইতে কোনপ্রকারেই অপসারিত করিতে পারিলাম না। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম "মা, আমি যে উদাসীন হইব না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এখন বিবাহের কোনও ইচ্ছা নাই। তুমি জোর করিয়া বিবাহ দিলে, আমি চিরকালের জন্য অসুখী হইব। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। এই পল্লীর অনতিদূরে আমি যে মৌজা ক্রয় করিয়াছি, সেই স্থানে আমি একটী ঘর প্রস্তুত করিব। সেই স্থানে নিয়ত থাকিলেও, আমি প্রত্যহ তোমাদের চরণদর্শন করিতে আসিব ও সেবাশুশ্রূষা করিব। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের লোকেরা আশ্রমে কঠোরভাবে জীবনযাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সেইদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি এই অপেক্ষাকৃত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে না পারি, তাহা হইলে কি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়!" এই বলিয়া আমি তাঁহার নিকট আর্য্য-গণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, আর্য্যমহিলা গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করিলাম এবং পরিশেষে আমার সঙ্কল্পটি অনুমোদন করিতে তাঁহাকে অনুনয় করিলাম। পুত্রবৎসলা জননীদেবী আমার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি আমার বিবাহ দেখিলে যে সুখে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে পারিবেন; সেই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

সত্যকেও আমার সঙ্কল্পের কথা সমস্ত জানাইলাম। সত্যও আমাকে প্রথমে কিঞ্চিৎ বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে সেও

আমার সঙ্কল্পটির অনুমোদন করিল। এইরূপে চারিদিকের পথ পরিষ্কৃত হইলে, আমি পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে আমার অভিলষিত মনোরম স্থানে একটী আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাইলাম। স্থানটীর নাম পলাশবন। কিন্তু নামটী পলাশবন না হইয়া শালবনই হওয়া উচিত ছিল। সেই স্থানের কিয়দ্দূরে কতিপয় পলাশ-বৃক্ষ থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না যে, তদ্দ্বারা সেই স্থানটি তাহাদের নামেই অভিহিত হইতে পারে। আবাস-বাটীর সন্নিকটেই শ্যামল শালবন শোভা পাইতেছিল। অনতি-দূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটিরও নাম পলাশবন। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরীহ কৃষক ; কিন্তু সেখানে কতিপয় ঘর ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতিও বাস করিত। গ্রামবাসী ব্যক্তিরা আমাকে তাহাদের প্রতিবাসী হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি একটী শুভ দিনে বাস্তু-শান্তি করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিরূপ স্থলে বাটী নির্ম্মিত হইল, তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাউক। পিতৃদেব যে স্থানটী বসবাসের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটী বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে। এই ভূখণ্ডের উত্তর ভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটী অনুচ্চ শৈল। শৈলের উপরে দুই একটী পলাশ-বৃক্ষ ও আরণ্য লতা ভিন্ন আর কোনও উদ্ভিদ্ নাই। বোধ হয়, বহুপূর্ব্বে শৈলটি একটী অখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর ছিল; কিন্তু তাহা কোনও নৈসর্গিক কারণে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এই শৈলের পাদ-মূলে ও চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তররাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে; দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী স্থানটির শোভাবর্দ্ধনের জন্য অতিশয় যত্নসহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রস্তরখণ্ড ও কৃষ্ণপ্রস্তর-স্তূপসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে ভীষণতা আনয়ন করিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়; যেন আরণ্য হস্তিযূথেরা যদৃচ্ছাক্রমে শয়ন ও উপবেশন

করিয়া সেই স্থানে বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছে। সেই স্থানে পলাশবৃক্ষ ভিন্ন প্রায় অন্য জাতীয় বৃক্ষ নাই। একটী ক্ষুদ্র তটিনী কোন্ এক অজ্ঞাত নিভৃত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই শৈলের পাদমূল প্রক্ষালন করিতে করিতে অদূরে শ্যামল অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলধারা উল্লাসে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফপ্রদান করিতে করিতে এক মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে। শৈলের পাদমূল হইতে ভূখণ্ডটি আনত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়াছে। এই ভূখণ্ড বনাচ্ছন্ন; কিন্তু বন নিবিড় নহে, এবং বৃক্ষাদির মধ্যে শালবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষও বিস্তর। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত স্থলে কতকগুলি শাখাপ্রসারী প্রগাঢ়-ছায়া-সমন্বিত বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমগ্র ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় চারি শত বিঘা। ইহার উত্তর দিকে পূর্ব্বোক্ত শৈল ও পলাশবৃক্ষরাজি; পশ্চিমদিকে যমুনা তটিনী ও নিবিড় বন; দক্ষিণদিকে যমুনা ও গুল্মাচ্ছন্ন ভূমি; পূর্ব্বদিকে একটী গ্রাম্য রাজপথ; এই পথের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগেই পলাশবন গ্রাম, যাহার কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

গ্রাম্য রাজপথের পশ্চিম ভাগে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ভূমি বনাচ্ছন্ন নহে। পূর্ব্বে অবশ্য এখানে বন ছিল; কিন্তু তাহা কর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি প্রয়োজনীয় সুন্দর বৃক্ষই যদৃচ্ছাক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই বৃক্ষগুলি কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া স্থানটিকে মনোরম করিয়াছে। আমি এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে আবাসবাটী প্রস্তুত করাইলাম। আবাসবাটী দক্ষিণ-দ্বারী; তাহার বামভাগে অদূরে গ্রাম্য রাজপথ ও পলাশবন গ্রাম; দক্ষিণভাগে কতিপয় হস্ত দূরেই শালবন; সম্মুখে কিয়দ্দূরে যমুনাতটিনী ও গুল্মাবৃত ভূমি; তটিনীর পর পারে আবার শ্যামল বন। পশ্চাতে শালবন ও শৈল। বাটীর অব্যবহিত তিন

দিকেই বৃহৎবৃক্ষশোভিত পরিষ্কৃত ভূমি, কেবল পশ্চিম দিকটিই শাল-বনের সহিত একবারে সংলগ্ন।

বাটীটি ইষ্টক নির্ম্মিত হইল। একটী বৃহৎ পরিবার যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারে, পিতৃদেব তদুপযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করাইলেন। আমি কিন্তু এত বড় গৃহের পক্ষপাতী ছিলাম না। দ্বিতলেও কতিপয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। এরূপ উচ্চ ভূমিতে দ্বিতল গৃহেরও কোন আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু কেবল চতুর্দ্দিকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্যই ঈদৃশ গৃহ-নির্ম্মাণের আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলাম। দ্বিতলের একটী গৃহ পাঠগৃহে পরিণত হইল। ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তকাবলী সেখানে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিলাম। তিন দিকের গবাক্ষ উন্মোচন করিলে, সেই গৃহের মধ্যে বসিয়াই প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতে পাইতাম। কত অজ্ঞাতনামা সুকণ্ঠ আরণ্য পক্ষী বাটীসংলগ্ন বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অমৃতধারা বর্ষণ করিত। আরণ্য-কপোতের কূজনে সেই স্থান প্রায় সর্ব্বক্ষণই প্রতিধ্বনিত হইত। কখন একটী হরিণশিশু সহসা নয়নপথে পতিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া যাইত; কখনও বা শশকেরা নির্ভয়ে বিবর হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের সুকোমল পত্রগুলি চর্ব্বণ করিত। দূরস্থিত নিবিড় অরণ্য হইতে কখন কখন ময়ূরের কেকারবও শুনিতে পাইতাম। বলা বাহুল্য পলাশবন বা তাহার সন্নিহিত স্থানসমূহে হিংস্র জন্তুর তাদৃশ ভয় ছিল না। হিংস্র জন্তুরা অরণ্যে থাকিলেও লোকালয়ের সন্নিকটে প্রায় আসিত না। আমি বহুকাল মৃগের ন্যায় অরণ্যে বিচরণ করিয়াছি; কিন্তু কখনও কোনও হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়ি নাই।

আমার আবাসবাটীর কথা বলিলাম; এক্ষণে পলাশবন গ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাউক। জনসমাজমধ্যে বাস করিবার প্রবৃত্তি

মানব-হৃদয়ে এরূপ প্রবল যে, অতীব নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও, আমরা লোকসমাজ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসি না। মানবের মুখমণ্ডলে যে একটী অপূর্ব্ব আত্মীয়তা ও সমবেদনার ভাব অঙ্কিত আছে, তাহা জড়, উদ্ভিদ্ বা নিকৃষ্ট প্রাণিজগতে সহস্র চেষ্টা ও অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকৃষ্ট জীবেরাও স্ব স্ব শ্রেণীতে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। আমি যেখানে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিলাম, তাহার সন্নিধানে যদি গ্রাম না থাকিত, তাহা হইলে আমি ঐ স্থানে কখনও একাকী বাস করিবার সঙ্কল্প করিতাম কিনা, সন্দেহ স্থল। যাহা হউক, এই গ্রামের নিকটে বাস করিয়া আমি যার পর নাই সুখে কালযাপন করিতেছি ও নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। গ্রামের নিরীহ কৃষকদের সহবাসে আমি যে আনন্দ-ভোগ করিয়াছি, বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির সহবাসেও তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হই নাই। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে যেরূপ স্নেহ, দয়া ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য নহি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ই পলাশবনের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার উদারচরিত্র, উন্নত ধর্ম্মজীবন ও গভীর জ্ঞানের যথোচিত তুলনা হয় না। তাঁহার গৃহিণী একটী আদর্শ গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রকন্যারা আদর্শ পুত্র-কন্যা। যথাসময়ে পাঠকবর্গ ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইবেন। ইঁহা-রাই কৃষক ও অন্যান্য পরিবারবর্গের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সামান্য কুটীরে যে জ্ঞান, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অস্পষ্ট ছায়াও যে কখন আমার গর্ব্বিতচূড় দ্বিতলগৃহে দেখিতে পাইব, তাহার আশা করিলাম না। এই অজ্ঞাত-নামা পলাশবনে যে শেষে আমার বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানগরিমা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সকলই ভগবানের লীলা!

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া অবধি, আমি কি জন্য পলাশ-বনে আসিয়া বাস করিলাম, তাহা কাহাকেও পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি যে পলাশবনের ন্যায় একটী গ্রাম সমুজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহা আমি কেন, অনেক ব্যক্তিই জানিতেন না। ইহার একটী কারণও ছিল। গোস্বামী মহাশয় পলাশবনের আদিম নিবাসী নহেন; ইনি সবে দুই তিন বৎসর মাত্র পলাশবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে হুগলি জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে ইঁহার পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। কিন্তু হুগলি জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, রোগযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, ইনি পলাশবনে আসিয়া সপরিবারে এক শিষ্যের বাটীতে কিয়দ্দিন বাস করেন। দরিদ্র শিষ্যের বাটীতে বহুদিন থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, ইনি এই গ্রামে একটী স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করেন। পলাশবনে অবস্থানকালে ইঁহার উন্নত ধর্ম্মজীবন ও উদারচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া প্রায় গ্রামশুদ্ধ লোকই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তাহাদেরই সবিশেষ অনুরোধক্রমে ইনি পলাশবনে বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন।

এই সঙ্কল্পানুসারে ইনি স্বদেশের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে পলাশবনে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং তাহার উপসত্বেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত হন।

আমার গৃহনির্ম্মাণ-কালে তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য, পিতৃদেব প্রায়ই পলাশবনে গমনাগমন করিতেন। এইরূপ দুই চারিবার গতায়াত করিতে করিতে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। গৃহ প্রস্তুত হইলে আমি যে দিন পলাশবনে গৃহ দেখিতে প্রথম আসিলাম, সেই দিন পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমি যে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তাহা পলাশবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শুনিয়াছিল, সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমার আর নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হইল না। আমরা সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাঁহার বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন বৃহৎ আটচালাটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রামবাসিনী বর্ষীয়সীরাও সেখানে একত্র হইয়াছেন। খোল, করতাল ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্র সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই লোকারণ্যের মধ্যে একটী উচ্চ বেদী; বেদীটি নানাবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেরই গলদেশে এক একটী পুষ্পমালা লম্বিত। বেদীর উপর একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে একটী ধর্ম্মগ্রন্থ চন্দনচর্চ্চিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, পিতৃদেবকে দেখিবামাত্র সকলে প্রণাম করিল এবং ইঙ্গিতে আমার পরিচয় পাইয়া আমাকেও অভিবাদন করিল। আমি উপবিষ্ট হইলে, দেখিলাম সভাস্থ সকলেই কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। পিতা আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে 'গোস্বামী মহাশয় কোথায়', এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ব্যক্তি উত্তর

দিবার পূর্ব্বেই, গোস্বামী মহাশয় আটচালা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল; পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে, সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। গোস্বামী মহাশয় পিতৃদেবকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরিচয় পাইয়া আমারও যথোচিত সমাদর করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণ শুনিয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সৌম্য ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই সেই ভক্তির উদয় হইল। আমাকে দেখিয়া তিনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন, আমি পলাশবনে বাস করিলে গ্রামবাসী সকলেই যার পর নাই আনন্দিত ও উপকৃত হইবে এবং আমার সংকল্প যে সাধু এবং আজিকালিকার দিনে কিছু আশ্চর্য্যেরও বিষয়, এই সম্বন্ধে পিতৃদেবের সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া তিনি বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাঠারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইল। গয়ারাম ঘোষ নামক জনৈক প্রবীণ গ্রামবাসী গায়কদলের নেতা হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তিরসের মধুর স্রোত ছুটাইলেন। আমি অনেক সুগায়কের মধুময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু গয়ারাম ঘোষের তানলয়হীন ভক্তিমিশ্রিত আড়ম্বরশূন্য সরল হরি-সঙ্কীর্ত্তনে আমার অন্তরাত্মা যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিল, এরূপ পরিতৃপ্তি আমি বহুকাল অনুভব করি নাই।

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে পল্লীর বালকবালিকারা দলে দলে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের অন্তঃপুর হইতেও দুইটী বালিকা ও একটী বালক আসিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইল। বালকটী সর্ব্বকনিষ্ঠ। আকার প্রকারে বুঝিলাম, ইহারা গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যা। ইহাদের সকলেই শান্তমূর্ত্তি, সুশ্রী ও

সৌষ্ঠবসম্পন্ন। ইহাদের সকলেরই মুখমণ্ডলে মাধুর্য্য ও পবিত্রতাব্যঞ্জক কেমন একটী দিব্য লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছিল। সে লাবণ্যের এরূপ আকর্ষণী শক্তি যে, একবার তাহাতে চক্ষু পড়িলে, সহজে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। চক্ষু যেন সেই লাবণ্যসুধা অতৃপ্তরূপে পান করিতে থাকে। আমি প্রাণস্পর্শী মধুর হরি-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে দেবতার ন্যায় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন সেই বালকবালিকাগুলিকে দেখিয়া মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন পাপকোলাহলময় সংসারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক দেবরাজ্যে আসিয়াছি। মুহূর্ত্তমধ্যে এই স্থূল জড়দেহ যেন পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল; অশরীরী লঘু আত্মা যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে কোনও জ্যোতিষ্কের ন্যায়, সেই সঙ্গীতোদ্দীপিত ভাবরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক কথায়, কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব মহাসঙ্গীতের সহিত আমার আত্মার গভীর সঙ্গীত যেন মিলিত হইয়া গেল এবং আমিও যেন স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্গীত নিবৃত্ত এবং সভাস্থল নীরব হইল; কিন্তু আমার আত্মার মধ্যে যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছিল, তাহার আর নিবৃত্তি হইল না; গোস্বামী মহাশয় যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না ও সেই সভাস্থ কোন ব্যক্তিই আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইল না। আমি এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম। কতক্ষণ এইভাবে নিমগ্ন ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। তবে তাহা যে বহুক্ষণ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোস্বামী মহাশয় সে রাত্রির মত ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পিতৃদেব আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিলেন "দেবু, তোমার কি নিদ্রা-

কর্ষণ হইতেছে? রাত্রি অধিক হইয়া থাকিবে; চল, অদ্যকার মত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করা যাউক।” এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, আমিও তাঁহার কথায় সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সহসা দণ্ডায়মান হইলাম। তৎপরে উভয়ে গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। গ্রামস্থ ব্যক্তিরাও একে একে গৃহে গমন করিতেছিল; কেহ কেহ আমাদের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া আবার গৃহে প্রত্যাগত হইল। আমরা পিতাপুত্রে আরণ্য পথ বহিয়া চলিতে লাগিলাম।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। জ্যোৎস্নালোকে আরণ্য রাজপথ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছিল। পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী শালবনের মনোহারিণী শোভা নয়নযুগলের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। বৃক্ষরাজি নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা সুধাকরের সুধাংশুরাশি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করিতেছে; যেন তাহাদেরও সরস হৃদয় মধ্যে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছে। নীরব আরণ্য পথে, বনের এই বিচিত্র ভাব ও শোভা দেখিতে দেখিতে, স্বপ্নাবিষ্টচিত্তে পিতৃদেবের সহিত চলিতে লাগিলাম। সহসা তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“দেবু, গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া তোমার মনে কি হইল?”

আমি বলিলাম “গোস্বামী মহাশয়কে মাহাত্মা ব্যক্তি বলিয়াই আমার মনে হইল। এরূপ ব্যক্তির নিকটে থাকিতে পাইব বলিয়া, আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।”

পিতৃদেব বলিলেন “গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে আমারও ঐরূপ মত বটে। তুমি কি তাঁহার ছেলে মেয়েগুলিকে দেখিয়াছিলে?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন্ ছেলে মেয়েগুলি? যা'রা তাঁ'র দক্ষিণ দিকে ব'সে ছিল, তারাই কি?"

পিতৃদেব বলিলেন "হাঁ, তারাই বটে।"

আমি বলিলাম "বেশ ছেলে মেয়েগুলি।"

পিতৃদেব নীরব হইলেন; আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। আমিও যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ভয় হইতেছিল, ভাগবতের যে বিষয় অদ্য ব্যাখ্যাত হইতেছিল, পাছে তাহারই সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলেন। সে রাত্রিতে কি বিষয় পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা আমি আদৌ জানিতাম না। যাহা হউক, পিতৃদেব নীরব হইলে আমার চিন্তাস্রোত কি-জানি-কেন গোস্বামী মহাশয়ের সেই ছেলেমেয়েগুলির দিকেই প্রধাবিত হইল। সেই সুন্দর মুখগুলি আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি মুখ কেমন সুন্দর ও পবিত্র! যেন সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য; যেন পবিত্রতার মধ্যেও পবিত্রতা! কি-জানি-কেন আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল।
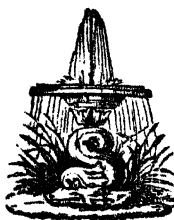
দশম পরিচ্ছেদ।

পলাশবনে আসিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলাম। আমার নূতন গৃহে প্রথম কতিপয় দিবস প্রায় প্রত্যহই বহু লোকের সমাগম হইত। কিন্তু সকলের সহিত পরিচয়-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল। গ্রাম-বাসী অধিকাংশ ব্যক্তিকেই কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে হইত। আমার মত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি গ্রামে অত্যল্পই ছিল। সুতরাং আমার নিকটে আসিয়া সময় নষ্ট করিবার অবসর কাহারই ছিল না। কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিরা দিবসের অধিকাংশ ভাগ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; কেবল সন্ধ্যার পর তাহাদের কিছু অবকাশ হইত। এই অবকাশ সময়টি তাহারা সাধারণ আটচালা-গৃহে গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-শ্রবণে অতিবাহিত করিত। আমিও হরিসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-কথা শুনিবার আশায় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হইতাম।

গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যাগুলিকে প্রতিদিন বেদীর দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতাম। জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম অনুমান দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে। শুনিলাম কন্যাটির তখনও বিবাহ হয় নাই! কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত হয় নাই বলিয়াই, বিবাহ হয় নাই, নতুবা অনেকদিন বিবাহ হইয়া যাইত। গোস্বামী মহাশয় পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করায়, যোগ্য-পাত্র-সন্ধানের পক্ষে কিছু বিলম্ব ও অসুবিধা ঘটিতেছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পশ্চিম বঙ্গের আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে একটীও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নাই। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করা অপেক্ষা কন্যার আরও কিছু দিন অনূঢ়া থাকা ভাল, শুনিলাম গোস্বামী মহাশয়ের ইহাই মত। গয়ারাম ঘোষের মুখে গোস্বামী মহাশয়ের এই মত শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যভাব-বর্জ্জিত জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে এরূপ মত হইতে পারে, ইহা আমার নিকট কিছু অভিনব ও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।

আমি যাহাতে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, তদ্বিষয়ে গ্রামবাসী ব্যক্তিরা যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল। কেশব ঘোষ নামে একটী পিতৃ-মাতৃহীন কৃষক যুবা আমার একান্ত অনুগত হইল। তাহার ভূসম্পত্তি কিছুই না থাকায়, সে দৈহিক পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ দ্বারা কোনও প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। তাহার পবিত্র স্বভাবের জন্য গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকে ভাল বাসিত। আমিও কেশবের দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ ও সরল সানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া বড় প্রীত হইতাম। তাহাকে আমার নিকটে রাখিবার অভিপ্রায়ে, আমি তাহার উপযুক্ত মাসিক বর্তন স্থির করিয়া, তাহাকে আমার গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।

আমার আবার গৃহকার্য্য কি, তাহা হয়ত পাঠকবর্গের জানিতে

কৌতুহল হইয়া থাকিবে। গৃহ-কার্য্য আর কি? গৃহটিকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, আমার পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যগুলির যত্ন করা এবং আমার অনুপস্থিতিতে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করা। কেশবের ইহাই গৃহকার্য্য ছিল। জননীর অনুরোধে আমি বাটীতেই আহার ও শয়ন করিতাম। আমি যে জঙ্গলের মধ্যে, গ্রামের বহির্ভাগে ও এক জনশূন্যপ্রায় গৃহে বাস করিয়া থাকিব, এ প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার মনে অনর্থক কষ্ট দেওয়াও আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। সুতরাং আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পলাশবনে আগমন করিতাম এবং কেশবের নিকট বিগত নিশার সংবাদাদি শুনিয়া ভ্রমণ জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতাম। ভ্রমণের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দিক্ ছিল না। কিন্তু আমি প্রায়শঃ সর্ব্বাগ্রে গৃহের উত্তরদিকৃস্থ সেই কৃষ্ণ শৈলের নিকট উপস্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতাম এবং সেই উচ্চস্থান হইতে একবার চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিয়া লইতাম। নৈসর্গিক-শোভা-সন্দর্শনে নয়নমন কিয়ৎপরিমাণে পরিতৃপ্ত হইলে আমি যমুনাতটিনীর বক্রগতি ধরিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যের নানাস্থানে উপস্থিত হইতাম এবং প্রকৃতির ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতাম। প্রথমে যমুনার অনুসরণ করিতে করিতে আমি আমার বাটীর পশ্চিম দিকৃস্থ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতাম, পরে গৃহের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতাম। সেই দিকে যমুনাতটবর্ত্তী উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে উপনীত হইতাম। তৎপরে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া নিজ কুটীরে উপনীত হইতাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান ও কিছু ভক্ষণ করিয়া পাঠগৃহে প্রবেশ করিতাম। সেখানে ইচ্ছামত পাঠাদি সমাপন করিয়া বাটীতে

আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতাম। অপরাহ্ন সময়ে আবার আমি পলাশবনে আসিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতাম এবং সন্ধ্যার পর আটচালায় হরিসঙ্কীর্ত্তন ও গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আবার বাটীতে প্রত্যাগত হইতাম। গৃহ পর্য্যন্ত প্রায়ই কেহ সঙ্গে যাইত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কোন লোকেরই প্রয়োজন হইত না। তবে অন্ধকার হইলে, একটা আলোকের আবশ্যকতা অনুভব করিতাম। সেই সময়ে জননী দেবী বাটীর ভৃত্যকে আলোকসহ পলাশবনে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু নিজের লোক কেহ সঙ্গে না থাকিলেও পথে লোকের বড় একটা অভাব হইত না। গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে ভক্তেরা প্রত্যহই পলাশবনে উপস্থিত হইত।

জননীদেবী একদিন পলাশবনে আসিয়া আমার গৃহ দেখিয়া গেলেন। গৃহ ও স্থানটি দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া জননীর সহিত পরিচিত হইল। গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী জননীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। আমারও সেইদিন গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ হইল। জননীদেবী সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। আমিও যথাসময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে সেই দিবস যাপন করিয়া যার পর নাই পুলকিত হইয়া থাকিবেন; যেহেতু তিনি পুনঃ পুনঃ সেই স্থানের, গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের, এবং সর্ব্বোপরি গোস্বামিপত্নী ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্তদের উল্লেখ করিয়া তিনি প্রতিবাসিনী বঙ্গলাপিনীকে বলিতে লাগিলেন,

"যেমন মা, তেমনি ছেলেমেয়েগুলি। যেমন মুখের গড়ন ও শ্রী,

তেমনি স্বভাব,—আহা, কেমন শান্ত, শিষ্ট, সদানন্দ। দেখ্‌লে, চোখ জুড়োয়। আমি যতক্ষণ ছিলুম, ছেলেটি আর মেয়ে দুটি এক দণ্ডের তরেও আমার কাছছাড়া হয় নি। বড় মেয়েটির নাম যোগমায়া। যোগমায়া তো যোগমায়াই বটে, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। রূপ যেন উছ্‌লে পড়্‌ছে। মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নি। মেয়ের বাপ মা দেশ ছেড়ে এখানে আছে; আর এই বন-জঙ্গলের দেশে ভাল পাত্রও পাওয়া যাচ্চে না, তাই বিয়ে হ'তে এত দেরী হ'চ্চে। মেয়ের মা এর জন্যে কত ভাবনা চিন্তে কর্‌ছিল। মেয়েটিকে দেখে আমার দেবুর কথা ভাব্‌ছিলুম; কিন্তু আমার কেমন দুরদেষ্ট, দেবু আমার যেন সন্নিসি হ'য়ে গেছে? এই দেখনা, সে কত নেখাপড়া শিখেছে, যেন বিদ্যের একটা জাহাজ। কিন্তু দেবু চাকরী বাকরী কর্‌লে না; চাকরী কর্‌লে সে আজ একটা মস্ত বড় চাক্‌রে হ'তে পার্‌তো। আমার আর দুটি ছেলে তোমাদের আশীর্ব্বাদে বড় বড় চাকরী কচ্চে, আর বৌ ছেলে নিয়ে সুখে আছে; কেবল দেবুই আমার কেমন এক রকম হ'য়ে গেল! দেখ, তার কোন বিষয়ে সক্‌ নেই, কারুর সঙ্গে আমোদ করা নেই, আহ্লাদ করা নেই, দুটো কথা বলা নেই, একটা ভাল কাপড় পরা নেই, যেমন তেমনেই সন্তুষ্ট—আর কি এক রোগ হ'য়েচে, দিন নেই রাত নেই, পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াচ্চে, আর কেবল বই পড়্‌চে, আর একলা আছে, আর বিয়ের নাম করলে তেলেবেগুণে জ্বলে উঠ্‌চে। কেন যে দেবু এমনতর হ'ল, তা তো আমি জানি না। আমার অদৃষ্টে যে কি আছে, তা ভগবানই জানেন। দিদি, আমার সব সুখ হ'য়েও কিছু হয় নি। দেবু আমার বড় আদরের সামিগ্রী; দেবুকে আমার সংসারীর মতন দেখে গেলে আমি সুখে মর্‌তে পার্‌তুম; কিন্তু সে সুখ আমার কপালে নেই!"

এই বলিয়া জননীদেবী নিরস্ত হইলেন। শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। আমি যদিও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া নিশ্চিত দুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িয়াছিল ; যেহেতু বগলাপিশী তৎক্ষণাৎ আমার আচরণের উপর কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "দেখ বৌ, তুমি কেঁদো না। তোমার কিসের কষ্ট যে, তুমি চোখ থেকে জল ফেল? বল্লে তুমি রাগ কর্‌বে তাই বলি নি ; তা নইলে আসল কথা বল্‌তে গেলে, দেবুর তো আমি তত দোষ দিই না। তার আর দোষ কি? যত দোষ তার বাপের। এ কথা তোমার কাছে বল্‌চি, আর সকলের কাছেও বল্‌বো। সত্যি কথা বল্‌বো, তার আর ভয় কি? আমরা যখন বিয়ে দিতে বল্লুম, তখন ছেলের বিয়ে দেওয়া হলো না। বাপ ছেলেকে নাই দিয়ে দিয়ে তালগাছে তুলে ফেল্‌লেন। এখন ছেলে খিঙ্গী হ'য়ে বনের মাঝে একটা ঘর ক'রে ব'সেচে। আর ছেলেরই বা তোমার এ কি রীত গা? বাপ মা রইলেন এখানে, ছেলে রইলেন ওখানে ; এ কোন্ দেশের কথা গা? ছেলে তোমার বিদ্যের জাহাজ, তা নেই মান্‌লুম ; কিন্তু দেশে কি আর কারুর ছেলে লেখাপড়া জানে না? আর সকলের ছেলেই কি লেখা পড়া শিখে সন্নিসি হ'য়ে বেড়াচ্চে? এই ধর না তোমারই কথা। তোমার নৃপেন আর সুরেনও তো তোমার দেবনের চেয়ে কিছু কম লেখাপড়া জানে না ; কই তারা কি বৌ ছেলে ফেলে কৌপীন প'রে উদাসীন হ'য়েচে? আমি তোমাকে সত্যি বল্‌চি, ছেলের বাপই ছেলেকে এমন ক'রেচে। কিন্তু যাক্ ও সব কথা—এখন একটা কথা আমার মনে হ'চ্চে। গোস্বামীর মেয়ে যোগবালা—না—কি নাম বল্লে?—ঐ মেয়েটি ডাগর আর প্রতিমার মত সুন্দরী বল্‌চো। আমার বেশ মনে ধ'রচে ঐ মেয়েই দেখো তোমার

বৌ হ'বে। তুমি আজকালকার ছেলেগুলোকে তো চেনো না ভাই। ওরা এক ধারার ছেলে; সোজা পথে তো কখনও যাবে না! স্পষ্ট ক'রে বল্লেই তো হ'তো যে, ঐ মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তবে বিয়ে ক'র্‌বো, তা নইলে কর্‌বো না। এত মারপেঁচে কাজ কি বাবা? হুঁঃ—,তোমার দেবন আগে ঐ মেয়েটাকে দেখে যদি পলাশবনে ঘর না ফাঁদিয়ে থাকে, তবে আমার নাম বগলাসুন্দরীই নয়। বনে জঙ্গলে বেড়ানো আমরা আবার বুঝি না? দেখো, ঐ যোগবালাই তোমার বৌ হ'বে, এ কথা আজ আমি ব'লে যাচ্চি, আর তুমিও মনে রেখো। যখন আমার কথা সত্যি হবে, তখন বোলো।" এই বলিয়া বগলাসুন্দরী গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিলেন; জননী দেবীও তাঁহাকে কি বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত সদর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন। বগলাসুন্দরী এবং জননী দেবীও হয়ত মনে করিয়াছিলেন, আমি নিদ্রামগ্ন হইয়াছি। কিন্তু আমি শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া বগলাসুন্দরীর এই অদ্ভুত বক্তৃতা গলাধঃকরণ করিতেছিলাম এবং তাঁহার অন্তর্যামিতা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের বিচিত্র পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলাম। তদণ্ডেই বগলাসুন্দরীর সম্বন্ধে জননী দেবীকে দুই একটী কথা বলিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইল; কিন্তু আমি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া সে রাত্রিতে আর কোন কথা উত্থাপন করিলাম না। বগলাসুন্দরী যে সমাজে আছেন, সে সমাজে বাস করা বা জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা যে কিরূপ সহজ ব্যাপার, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। ক্রোধে ও অভিমানে হৃদয় বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিলে, সকলেরই হৃদয় এইরূপ ব্যথিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনের কেমন স্থিতিস্থাপক গুণ, কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষুদ্রমনা বগলার উপর আমার আর কিছুমাত্র ক্রোধ রহিল না। নিরক্ষরা, নির্ব্বুদ্ধি, প্রগল্‌ভা, বৃথাভিমানিনী বগলার যে এইরূপ স্বভাব হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? যোগমায়ার সহিত কোনও দিন আমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই কন্যা-লাভের উদ্দেশ্যেই যে আমি পলাশবনে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বকধার্ম্মিকের ন্যায় বসিয়া আছি, এ কথা অতীব নীচ, ঘৃণিত ও অসত্য। কথা যখন অসত্য, তখন আমার ক্রোধের আর কারণ কি? আমার মনের যাহা প্রকৃত অবস্থা, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ জানেন; তিনি জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। যেহেতু আমি আমার চিন্তা ও কার্য্যকলা-পের জন্য একমাত্র তাঁহারই নিকটে দায়ী। বগলা যদি অন্যরূপ জানে, তাহাতে আমার তত ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে

সংসারের প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল এবং পরমেশ্বরকে ভুলিয়া লোকে অসত্যের কিরূপ সেবা করে, তাহাও মনে হইতে লাগিল। শেষে সাধু-চরিত্র মহাপুরুষগণের কথা মনে পড়িল। জগতের উপকার করিতে গিয়া কত মহাপুরুষকে যে কত গ্লানি, নিন্দা, অযথা দোষারোপ ও নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তো কীটানুকীট, কোন্ ছার! পরার্থের কথা দূরে থাকুক, আমি তো স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার সন্তপ্তমন কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইল। কিন্তু আমার বিবাহ-বিষয়ে জননীর উদ্বেগ বুঝিতে পারিয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। নানা-কারণে, সে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না।

প্রভাতে উঠিয়া পলাশবনে যাইতে যাইতে আমার বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইরূপ চিন্তা মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া আমার মানসিক শান্তি বিনষ্ট করিত। আমি বেশ বুঝিতাম, বিবাহ করিলে পিতা মাতা উভয়েই অত্যন্ত সুখী হন, এবং পিতামাতাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন, পিতামাতা পুত্রের উপর প্রীত হইলে, দেবতারাও তাহার উপর প্রীত হন। বিবাহের প্রতি আমার যে কোন বিদ্বেষ ছিল, তাহা নহে। কিন্তু ইহাও বলা উচিত, বিবাহের জন্য আমার তাদৃশ আগ্রহ বা আস্থা ছিল না। আমি স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়। শান্তিতে কালযাপন করাই আমার একান্ত অভিপ্রেত। সচ্চিন্তা, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, পরমেশ্বরের আরাধনা এবং সাধ্যমত লোকের উপকারসাধন,—এইগুলিই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলির চরিতার্থতা-সম্পাদনোদ্দেশে আমি দুইটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্থির করিয়াছিলাম; প্রথমতঃ, অবিবাহিত থাকা; দ্বিতীয়তঃ, উদরান্নের সংস্থান করা। এই কারণে আমি বিবাহ

করিতে কোন মতেই সম্মত হই নাই, এবং উদরান্নের সংস্থানের জন্যও এই পলাশবন মৌজা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, আমার উপার্জ্জনের উপর কেহই নির্ভর করেন না; সুতরাং আমার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়কেই আমি প্রচুর এবং এমন কি, অতিরিক্তও মনে করিয়াছিলাম। বিবাহ করিলে পাছে আমার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে, ইহাই আমার প্রধান ভয় ছিল। স্ত্রী হয়ত বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন প্রকৃতির হইবে। যাহা আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা হয়ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইবে না। এইরূপ কারণ উপস্থিত হইলে, মনের মিলন না হওয়াই স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। স্বামী স্ত্রীর যদি মনের মিলন না হয়, তবে সে সংসারে আর শান্তি কোথায়? আমি ইচ্ছা করিয়া এই অশান্তি ও দুঃখ ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। ইচ্ছা করিয়া কয় জন স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে? তাহার পর, যদি মনের মিলনও হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইতে পারে। পরিবার বৃহৎ হইলে, এত অল্প আয়ে তাহাদের লালন পালন, সুশিক্ষা-সাধন ও বিবাহাদি প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার! এরূপ অবস্থা ঘটিলে, অন্ততঃ প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জনের জন্যও, আমায় চাকুরী হউক বা ব্যবসায় হউক, কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। তাহা হইলে আমার আর কি হইল? আমি তো আর নির্ব্বিবাদে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাইব না? সর্ব্বোপরি, সংসারের অনিত্যতা, প্রিয়জনবিয়োগ এবং সংসারের পাপময় কোলাহল আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বড় বিভীষিকা দেখাইত। এই সমস্ত কারণে, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ জীবনে বিবাহ করিব না, ইহাই এক প্রকার স্থির করিয়াছিলাম। সুতরাং বিবাহের চিন্তা হইতে আমি মনকে যথাসাধ্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাকে অন্যদিকে

প্রধাবিত করিতাম। সেই কারণে বিবাহের চিন্তা মনোমধ্যে বড় একটা উদিত হইত না। হইলে, তৎক্ষণাৎ কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভগবৎ-পদে নিয়োজিত করিতাম। বলিতে লজ্জা কি, যোগমায়াকে দেখিয়া এই দুর্ব্বল হৃদয়ে কখন কখন বিবাহের চিন্তা সমুদিত হইত। কিন্তু সহসা তৎক্ষণাৎ কি-জানি-কাহার বজ্রগম্ভীর রবে আমি কম্পিত হইয়া উঠিতাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনের মহাভাব ও মহালক্ষ্য আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিত। আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া সেই মহাভাবে নিমগ্ন হইতাম, এবং সেই মহালক্ষ্যপথে অদম্যতেজে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত হৃদয়ে নববল ও নবোৎসাহ সঞ্চিত করিতাম।

বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনের এইরূপ অবস্থা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জনক জননী বিবাহ-বিষয়ে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বড়ই ক্ষুব্ধ থাকিতেন। বিবাহের প্রস্তাবে আমি বিরক্ত হই, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা অনেক দিন সে সম্বন্ধে আর কোনও কথা উত্থাপন করেন নাই। তাহা দেখিয়া, আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, হয়ত কাল-ক্রমে তাঁহারা আমাকে উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইবেন। এই বিশ্বাসে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আমার ভবিষ্যৎ জীবন-পথ-নির্দ্দেশে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু গত রাত্রিতে জননীদেবীর মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, পলাশবনে যাইতে যাইতে, মনে বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিলাম না। বিবাহের প্রসুপ্ত চিন্তাগুলি জাগরিত হইয়া আমার মনকে বড়ই আলোড়িত করিতে লাগিল। একদিকে পিতামাতার সুখসম্পাদন, অপরদিকে আমার অবশ্যম্ভাবী পতন—এই দুইটী কঠোর সমস্যার মধ্যে মনের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ক্রমিক ঘাত প্রতিঘাতে মন নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমি কোন সুচারু সিদ্ধান্তেই

উপনীত হইতে পারিলাম না। পরিশেষে হতাশ হৃদয়ে ও ক্লান্ত মনে এক বৃক্ষের তলে অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় আমার অজ্ঞাতসারে নিমীলিত হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বেই আমি প্রাভাতিক মারুতহিল্লোলে, সেই সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।
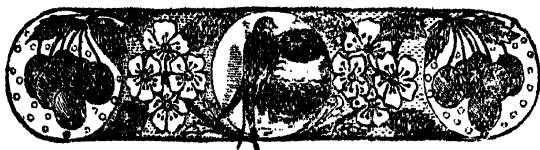
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিতাবস্থায় একটী ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম। আমার মনে হইল, আমি যেন গৃহে জননীর সন্নিধানে বসিয়া আছি। কিন্তু জননীদেবী রুগ্না ও রোগশয্যায় শায়িতা। তাঁহার দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ; মুখমণ্ডল মলিন ও নিষ্প্রভ, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কালিমাময়। রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁহার এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া অগ্রজ ভ্রাতারা গৃহে আগমন করিয়াছেন; জননীদেবী আমাদের সকলকেই তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া, কঠোর রোগযন্ত্রণার মধ্যেও, যেন সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কখনও তাঁহার শুষ্ক গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আবার কখনও বা তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় হইতেছে। জননীর আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া আমি যার পর নাই কাতর হইলাম। হৃদয় শোকে অবসন্ন হইল, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল এবং চতুর্দ্দিকে যেন ঘোর অমঙ্গলজনক

উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কালরজনী মুখ ব্যাদান করিয়া আমাদের সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাহারও মুখে একটীও বাক্য নাই; সকলেই বিষণ্ণ, নীরব ও শোকপীড়িত। সকলেরই মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত, এবং সকলেই অসহায়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। কালবৈশাখী অপরাহ্ণে, ভীম ঝঞ্ঝাবাত বহিবার পূর্ব্বে, প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা ঘটে, আমাদের গৃহেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। শোকমেঘে গৃহ অন্ধকারময় হইল; ঘোর বিপদাশঙ্কারূপ তড়িৎ-প্রকাশে আমরা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত ও শিহরিত হইতে লাগিলাম, এবং করালকালের ভীষণ হুঙ্কাররূপ গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে সকলে স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। জননীর শেষাবস্থা দেখিয়া আমি শোকাবেগ আর সংযত করিতে পারিলাম না; সকলের নিবারণ সত্ত্বেও ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহান্তরে গমন করিলাম।

সহসা আমি আহূত হইলাম। আহ্বান শুনিবামাত্র আমি জননীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। সকলে আমাকে জননীর সমীপে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কাতর-স্বরে ডাকিলাম "মা"। মা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং আমাকে আরও নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিয়া সাশ্রুলোচনে ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বাবা—আমার—উদ্—দাসীন—হইও না—আমু—মি—তোর সুখ্ দেখ্—লুম—না—আম্—সি তোর বিয়ে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। হতভাগ্য আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম এবং ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে হইতে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

সহসা বোধ হইল, কে যেন আমায় তুলিয়া ধরিল এবং "জল, জল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি যেন ঈষৎ সংজ্ঞা লাভ করিলাম এবং একবার চক্ষুও উন্মীলিত করিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম

না। আমার মস্তক যেন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং আমি যেন পুনর্ব্বার সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না; কিন্তু ধীরে ধীরে চেতনা-সঞ্চার হইবার উপক্রম হইলে, আমি যেন কাহার ভয়সূচক কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। একটী কোমল বালিকা-কণ্ঠও উৎকণ্ঠাসূচক স্বরে যেন বলিয়া উঠিল "দিদি, ভাল ক'রে বাতাস দে, বাতাস দে।" তৎপরেই আমি যেন মুখ-মণ্ডলে অঞ্চল-বিধূনিত মৃদুমন্দ বায়ু-সঞ্চালন অনুভব করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই চক্ষু খুলিলাম; খুলিয়াই দেখিলাম—কেশব ও উপরি-ভাগে নিবিড় হরিৎপত্ররাজি! কেশবের ঊরুদেশে আমার মস্তক রক্ষিত রহিয়াছে, এবং আমার মস্তক ও কপোল বহিয়া জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে!' ভাবিলাম, এ কি? আমি কোথায়? এখানে আমায় কে আনিল? জননীর সদ্য মৃত্যুচ্ছবি তখনও আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান; তখনও শোকোত্থিত উষ্ণ নিশ্বাস আমার নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠপুটে স্ফুরিত হইতেছিল। তাই সহসা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কেশব আমায় বাধা দিয়া বলিল, "আপনি একটুকু থির হয়ে থাক, ওরূপ ধড়্ ফড়্ কর্‌বেন নাই। এমন ক'রে একলা এখানে শুয়ে থাকৃতে হয়?" স্বপ্নের ঘোর তখনও আমায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই; সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্য আমি কেশবের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলাম। বসিয়াই দেখিলাম, আমি পলাশবনে আমার গৃহের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এবং আমার সম্মুখে যোগমায়া, সুশীলা ও ভূদেব—অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র কন্যারা এক একটী পুষ্পপূর্ণ পুষ্পাধার হস্তে দণ্ডায়মান! মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইলাম। আ ছিঃ ছিঃ, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত

এবং অপ্রতিভও হইলাম। ভাবিলাম, এই বালক-বালিকারা আমায় স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিতে দেখিয়া নিশ্চিত কেশবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এরূপ প্রকাশ্যস্থলে শয়ন করাটা ভাল হয় নাই। যাহা হউক, উপস্থিত দুরবস্থা হইতে কোনও রূপে মুক্তি লাভের আশায়, আমি একটু হাস্যের অভিনয় করিয়া, যোগমায়া ও সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলাম "তোমরা বুঝি ফুল তুলে ফিরে আস্‌বার সময় আমাকে এই গাছের তলায় শুয়ে থাক্‌তে দেখে ভয় পেয়েছিলে; তাই বুঝি কেশবকে ডেকে এনেচো?" যোগমায়া ব্রীড়ায় চক্ষুদুটী অবনত করিয়া আমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না; কিন্তু সুশীলা আমার কথার যেন প্রতিবাদ করিয়া বলিল "তা কেন? আমরা বনে ফুল তুলে এই পথে বেরিয়ে আস্‌চি, আর দেখ্‌লুম, আপনি এখানে শুয়ে ঘুমুচ্চেন, আর এক একবার হাত ছুড়্‌চেন, আর ফুকুরে ফুকুরে কেঁদে উঠ্‌চেন! তাই না দেখে, দিদি আর আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম। ভূদেব আপনার কাছে গিয়ে 'দেবেন বাবু, দেবেন বাবু' ব'লে দু তিনবার ডাক্‌লে। কিন্তু আপনার কোনই সাড়া পেলে না। আবার আপনি 'মা মা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। তাই দেখে, আমি ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলুম; কিন্তু দিদি বল্লে 'ওরে থাম্‌, যাস্‌নে; কেশবকে ডেকে আনি।' তাই আমরা তিনজনে দৌড়ে গিয়ে কেশবকে ডেকে আন্‌লুম। ভূদেব দৌড়াতে দৌড়াতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সুশীলার সরল হাস্য দেখিয়া আমারও হাসি পাইল। সুশীলা সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "ভূদেব যেমন পড়েচে, অমনি ওর সাজিশুদ্ধ ফুল মাটীতে উল্‌টে গেছে; আমি বল্লুম 'ওরে আর কুড়োস্‌ নে, আর কুড়োস্‌ নে, তোর ফুল ঠাকুর পুজোয় আর লাগ্‌বে না।' কিন্তু ভূদেব আমার কথা না শুনে, ঐ দেখুন, সব ফুল কুড়িয়ে এনেচে।"

এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিতে লাগিল। বেচারা ভূদেব সুশী-লার উচ্চহাস্যে অপ্রতিভ হইয়া যোগমায়ার পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিষ্ঠুর-হৃদয়া সুশীলা তাহাতেও বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "ওরে ভূদেব, দেখিস্ আমাদের সাজির সঙ্গে তোর সাজি ঠেকাস্ নে, তা হ'লে সব ফুল নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

ভূদেবকে বিপন্ন দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম। সুশীলার মুখে তাহার পতনের কথা শুনিয়া আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই ভূদেব, তোমার তো কোথাও লাগে নাই?" ভূদেব স্ফূর্ত্তির সহিত মাথা নাড়িল। আমি বলিলাম "আহা, তোমার ফুলগুলি সব নষ্ট হয়ে গেল!" ভূদেব তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল "নষ্ট হ'বে কেন? আমি এই ফুলে আমার নিজের ঠাকুর পূজো ক'র্‌বো।"

ভূদেবের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া ভূদেবের দিকে মুখ ফিরাইল। সরলপ্রাণা সুশীলা উচ্চৈঃ-স্বরে হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "দেবেন বাবু, ভূদেবের ঠাকুর দেখেছেন? একটা মাটীর পুতুল! মা ওকে পুতুলটো খেলা ক'র্‌তে দিয়েছিলেন; ভূদেব সেইটেকে ঠাকুর বানিয়ে রোজ রোজ পূজো করে। নিজের খাবার থেকে কিছু রেখে দিয়ে ঠাকুরকে তারই ভোগ দেয়, আর মাকে, আমাকে আর দিদিকে পের্‌সাদ দেয়।"

সুশীলার কথা শুনিয়া ভূদেবের মুখখানা বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় হইল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম "না, সুশীলা তুমি জান না; ভূদেব সত্যিকার ঠাকুর পূজো করে।" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িবার ইচ্ছায় সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা, তোমরা কেশবকে ডেকে আন্‌লে; তার পর কি হ'লো?" সুশীলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কেশব বলি-

"আচ্ছা, আমি আস্তে দেখ্‌লাম, আপুনি অত্যন্ত ঘামৃচো, হাত মাথা লাড়্‌চো, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌চো, আর এক একবার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চো। তাই দেখে আমার বড় ডর পেলেক্। আমি তুমাকে তিন চার বার ডাক্‌লাম; গালাড়া দিলাম; কিন্তু কোনও জবাব দেওয়া দূরে থাকুক, আপুনি কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লে। তাই দেখে আমি যোগ-মায়াকে ব'ল্‌লাম 'দিদি ঠাকুরাণ, আমাদের ঘর থেকে শীগ্‌গী এক ঘটী জল লিয়ে আস্‌তে পার?' দিদি ঠাকুরাণ জল আন্‌লে আমি সেই জল তুমার মাথায় ও মুখে দিলাম; আর দিদি ঠাকুরাণ আঁচল দিয়ে তুমাকে বাতাস ক'র্‌তে লাগ্‌লেক্। খানিক পরেই আপুনি জেগে উঠ্‌লে; যাই হোক্, ভাগ্যে তো দিদি ঠাকুরাণ আজ এইদিকে ফুল তুল্‌তে আইছিল, আর আমাকে ডেকে দিয়েছিল; তা না হ'লে কি হ'তোক্?" এই বলিয়া কেশব আমাকে তিরস্কারমিশ্রিত নানা প্রকার উপদেশের কথা বলিতে লাগিল।

যোগমায়াকে গমনোদ্যতা দেখিয়া, আমি সুশীলাকে বলিলাম "সুশীলা তুমি তো আমায় দেখে ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ুচ্ছিলে; ভাগ্যে তো তোমার দিদি ছিল, তাই কেশবকে এখানে ডেকে এনেছিল। আজ যোগমায়া না থাক্‌লে, হয়ত আমার কোনও বিপদ ঘট্‌তো।"

সুশীলার মুখখানা একটু গম্ভীর হইল। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল "কেন? আমি বাড়ী গিয়ে বাবাকে ব'লতুম, আর বাবা এসে আপনাকে দেখ্‌তেন?"

সুশীলার কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহার পর, তাহার ও যোগমায়ার দিকে চাহিয়া একটু কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিলাম "গত রাত্রিতে আমি ভাল ঘুমুতে পারি নাই, তাই এই গাছের তলায় 'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা কুস্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম;

আর এই ভাবে শু'য়ে থাকলে বড় কুস্বপ্নও দেখ্‌তে হয়। সে যাই হোক্, আমায় দেখে তোমরা যে বড় ভয় পেয়েছিলে, এই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কেশবকে ডেকে এনে তোমরা যে আমার উপকার ক'রেচো, তা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না। গোস্বামী মশাই মহাত্মা ব্যক্তি; তাঁর পুত্রকন্যাদের এইরূপ উপযুক্ত কাজই বটে। আমি আজ্‌কের এই ঘটনার কথা গোস্বামী মশাইকে স্বয়ং ব'লে আস্‌বো। মাও এই কথা শুনে যার পর নাই আনন্দিত হবেন। ভগবান্ এইরূপ ছেলেমেয়েদের মঙ্গল করেন। তিনি তোমাদিগকে সুখে রাখুন।" এই বলিয়া আমি ভুদেবকে বলিলাম "ভুদেব ভায়া, তুমি কিন্তু পড়ে যাওয়াতে আমি বড় দুঃখিত হ'য়েচি। আর ফুলগুলি——" আমার কথা শেষ না হইতে হইতে আনন্দময়ী সুশীলা ভুদেবের দিকে চাহিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ভুদেব বোধ করি বেগতিক দেখিয়া, এবং তাহার যে কোথাও লাগে নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য, সাজি-হস্তে ঘরের দিকে দৌড় মারিল, এবং খানিক দূর গিয়া, আমার দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল "দেবেন বাবু, এই দেখুন, আমার কোথাও লাগে নাই।" এই বলিয়া আবার দৌড় মারিল। সুশীলা হাসিতে হাসিতে তাহার দিদির সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল এবং "ওরে, দৌড়িস্‌নে রে, থাম্; আবার প'ড়ে যাবি" এই কথা বার বার বলিতে লাগিল। কিন্তু কে কার কথা শুনে? সুশীলা যত চীৎকার করে, ভুদেব তত দৌড়িতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা ধীরে ধীরে চক্ষুর অদৃশ্য হইল।

যতক্ষণ তাহারা নয়নগোচর হইতেছিল, ততক্ষণ আমি একদৃষ্টিতে এই কৌতুক দেখিতেছিলাম, এবং তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতেছিলাম। দেবরূপিণী যোগমায়ার দেব-হৃদয়ের কথা মনে করিতে করিতে আমার চক্ষুতে জল আসিল এবং তাহার উপর আমার

শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সরলপ্রাণা সুশীলার কথা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, এবং দেবশিশু ভূদেবের বীরত্বব্যঞ্জক স্ফূর্ত্তি দেখিয়া, আমি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই বালকবালিকাগুলির পবিত্র আকারে আমি যেন দেবরাজ্যের ছায়া দেখিতে পাইলাম। বহুদূরে গিয়া যোগমায়া একবার আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল; কিন্তু আমরা একদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছি, ইহা বুঝিতে পারিয়া আর ফিরিয়া চাহিল না। তাহারা দৃষ্টি-পথের অতীত হইলে, আমি সানন্দমুখে কেশবের দিকে চাহিলাম। কেশবের মনেও ঐরূপ কোনও চিন্তা হইতেছিল; যেহেতু সে আমাকে বলিতে লাগিল "যেমন আমাদের পুভু, তেমনই পুভুর ছেল্যাগুলি। আহা, পুভুর বড় বেটী যোগমায়াটি যেন সাক্ষেৎ মা লক্ষ্মী। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনই বেঁভার। অহঙ্কার নাই, ঘিন্না নাই, সকলের ছেল্যাকেই কোলে লিচ্চেন, আদর ক'চ্চেন, ঘরকে লিয়ে গিয়ে খেতে দিচ্চেন। এইরূপ করেন ব'লে, আমরা গেরামশুদ্ধা লোক কত ডরাই। বলি, একে পুভু কন্যা, তায় আবার যেন সাক্ষেৎ মা ভগবতী। বাপ্‌রে শূদ্দ্‌রের ছেলে কি ওঁর কোলে উঠ্‌তে পারে? আহা, দিদি ঠাকুরাণের বিয়ার জন্যে পুভু কত ভাব্‌চেন। পুভুর ভাবনা দেখে, আমাদেরও ভাবনা হয়। কিন্তু এক একবার ভাবি, দিদি ঠাকুরাণ চ'লে গেলে, আমাদের পলাশ-বন গেরাম যেন আঁধার হ'য়ে যাবেক্; দিদিঠাকুরাণ যেন গেরামের আল।"

কেশবের এই কথা শুনিতেছি, এমন সময় দেখি, বাড়ী হইতে ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে এ সময়ে হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল "মা ঠাকুরোণ কি জন্য আপনায় শীগ্‌গীর ডাকচেন।" আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে চলিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জননী আমায় অসময়ে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ভৃত্যকে অনেক প্রশ্ন করিয়াও কিছু জানিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি অনন্যমনে দ্রুতপাদক্ষেপে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পিতৃদেব বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অতএব, তাঁহার নিকট আর না দাঁড়াইয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম জননীদেবীও গৃহকার্য্যে নিযুক্তা; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিষন্ন ও চিন্তাভারাক্রান্ত; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি রোদনও করিয়াছেন, তাহা চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। তিনি গৃহের কার্য্যাদি করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহাতে যেন তাঁহার চিত্ত সংলগ্ন নাই। না করিলে নয়, এইরূপ ভাবেই যেন তিনি গৃহ-কর্ম্মাদি করিতেছেন। আমি ব্যাকুল-মনে চিন্তিত হৃদয়ে তাঁহার সন্নিহিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি এই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারে যার পর-নাই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইলাম এবং তাঁহাকে বারম্বার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দেওয়া

দূরে থাকুক, আরও রোদন করিতে লাগিলেন, এবং আমার মস্তক ও চিবুক স্পর্শ করিয়া হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি আমার ভ্রাতাদের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইলাম, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অদ্য কোনও পত্র আসিয়াছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া, মঙ্গলা দাসী গৃহান্তর হইতে আসিয়া আমায় বলিতে লাগিল "দাদাঠাকুর, তুমি অত উতলা হ'চ্চ কেন? সকলেই ভাল আছে; আজ কোথ্‌ থেকেও কোন পত্র আসে নি। মা আজ সকাল থেকে উঠে অবধি তোমার জন্যই কেঁদে কেঁদে আকুল হ'চ্চেন। ভোরের সময় স্বপন দেখেছিলেন, তুমি যেন সন্নিসি হ'য়ে কোথায় চলে গে'ছ। ভোরের স্বপন মিথ্যা হয় না কি না; আর মা উঠে তোমায় আজ দেখ্‌তেও পান নি; সেই অবধি কেবল কাঁদ্‌চেন আর কাঁদ্‌চেন। বাপ্‌রে, ও'র কান্না তো আমি আর দেখ্‌তে পারি না। যখন তখন কেবল তোমারি কথা নিয়ে কান্না হচ্চে। বলি, হেঁগা দাদাঠাকুর, তুমি এত নেখাপড়া শি'খেচো; বলি, নেখাপড়া শিখে কি মা'কে এম্নি ক'রেই কাঁদাতে হয়? তোমার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নেই? দেখ্‌চো না, মা কেবল তোমারই জন্যে ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেছেন? আর মাকে কাঁদিয়ে তোমার সুখ হয় নাকি? খেষ্টানী বিদ্যেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দণ্ডবৎ, বাবা! আমরা তো মায়ের চোখে জল দেখ্‌লে একেবারে ম'রে যেতুম। অত কথাতেই কাজ কি? এই ধর না, আমি তো ভগ্নী; আমারই চোখে একটু জল দেখ্‌লে আমার গদাই ভাই যেন অস্থির হ'য়ে যেতো!" মঙ্গলার এই তিরস্কারসূচক বাক্যের শেষ না হইতে হইতে পিতৃদেব অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আমিও তাঁহাকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত-সমস্ত হইলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন "কিসের আবার গোল হ'চ্চে, মঙ্গলা?" মঙ্গলা, গৃহ-

মার্জ্জনা করিতে করিতে মার্জ্জনী একবার জোরে আছাড়িয়া বলিল "কিসের আবার গোল! যে গোল চিরদিনই হয়, আজও তাই হ'চ্চে।" এই বলিয়া সে আবার সজোরে মার্জ্জনী সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে তাহার মার্জ্জনী আছাড় খাইতেছিল, তাহা এরূপ পরিষ্কৃত যে, সেখানে একবিন্দু সিন্দুর পড়িলেও অনায়াসে তাহা খুঁটিয়া লওয়া যাইত। মঙ্গলার ভাবগতিক দেখিয়া আমি মনে করিলাম, তাহার শক্তি থাকিলে আজ সে আমার বিষ ঝাড়িয়া ফেলিত।

পিতৃদেব আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া তামাকু খাইতে খাইতে একখানা বেঞ্চের উপর বসিলেন, এবং আমাকেও বসিতে বলিলেন। আমি অদ্যকার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, অবহিতচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন "দেবু, তুমি এতদিন বালক ছিলে; তাই তোমায় কিছু বলি নাই। কিন্তু এখন বলিবার সময় আসিয়াছে। তুমি জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান্ হইয়াছ। তোমার বিদ্যাশিক্ষার প্রশংসা শুনিয়া আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হই। দেশ-শুদ্ধ লোক একমুখে তোমার স্বভাব চরিত্র ও জ্ঞানের প্রশংসা করে। তুমি যে কোনও চাকরী বা কাজকর্ম্ম করিলে না, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নই। তুমি যে উদ্দেশ্যে পলাশবনে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা অতীব সাধু এবং আমিও তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু আমি কোন মতেই তোমার একটী সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না;—তুমি যে আজীবন অবিবাহিত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, আমার বিবেচনায় তাহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। সংসারী না হইলে মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান-লাভ হয় না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এতদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ। অতঃপর গৃহী হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর। গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ভগ-

বানের মহিমা ও কৃপা আরও বুঝিতে পারিবে। তুমি শান্তিপ্রিয়, তাহা আমি জানি। তুমি সংসারের কোলাহল, অশান্তি, বিপদ্ আপদ্ প্রভৃতির কথা চিন্তা করিয়া হয়ত তন্মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করিতেছ না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, পরমেশ্বর মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে বিপদ্ আপদের মধ্যে ফেলিয়া থাকেন। স্বর্ণে নিকৃষ্ট ধাতু থাকিলে, অগ্নি দ্বারা তাহা শোধিত হয়; সেইরূপ বিপদ্ আপদের মধ্যে পড়িলে, মানুষের অহঙ্কার অভি-মানাদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে নির্ম্মল ও একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হয়। বিপদ্, অশান্তি ও স্বজন-বিয়োগের আশঙ্কা করিয়া সংসার হইতে দূরে থাকা পৌরুষের চিহ্ন নহে, বরং কাপুরুষেরই লক্ষণ। এতদ্দ্বারা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করা হয়। দেখ, সংসারী হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করাই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা সাধ্যপক্ষে উচিত নহে। স্থল বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা দোষের না হইতে পারে; কিন্তু তুমি যে সেরূপ স্থল নও, ইহা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ সংসারে তোমাকে সুখই দিন আর দুঃখই দিন, দুইই মাথা পাতিয়া লইবে। সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান নহে। সুখের নিত্য সহচর দুঃখ। সুখ দুঃখ দুইয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। দুঃখ দেখিয়া ভয় পাইও না; অরণ্যে পলাইবার চেষ্টা করিও না। ভগবান্ না করুন, কিন্তু কখনও যদি তোমার ভাগ্যে দুঃখ বা বিপদ্ ঘটে, তবে তাহা বিধাতার বিধান ও ইচ্ছা বলিয়াই জানিবে। দুঃখে, বিপদে অধীর না হইয়া তৎসমুদয় সহ্য করিবে। তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ; তোমাকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একটী কথা আমি তোমাকে কর্ত্তব্য-বোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার নিজের সম্বন্ধে হইলে, তাহা বলিতাম না; কিন্তু তোমার গর্ভধারিণীর মুখ চাহিয়া

আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। তুমি বিবাহ না করায়, তোমার জননী যার পর নাই দুঃখিতা। ইনি তোমাকে সংসারী দেখিলে নিরতিশয় আনন্দিতা হন। তুমি অবশ্যই ইহা জানিতেছ, এবং মনে মনে বুঝিতেও পারিতেছ। জননীর সন্তোষ-বিধান করা তোমার একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য এবং আমার বিবেচনায় একটী প্রধান ধর্ম্ম্য কর্ম্মও বটে। পরের মঙ্গল ও সুখ সাধন করা যখন তোমার জীবনের একটী প্রধান ব্রত, তখন গর্ভধারিণী জননীর দিকে চাহিবে না, এ কিরূপ কথা? আত্মত্যাগ না করিলে কখনও পরের উপকার করা যায় না, এবং কোনও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। বিবাহ করিলে, যদি তোমার সুখের ব্যাঘাত ঘটে, আর তোমার জননীর আনন্দ হয়, তাহা হইলেও তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য। নিজে কষ্ট না সহিলে কি কখনও পরের সুখ সাধন করা যায়? কিন্তু বিবাহ করিলে, তোমার সুখের ব্যাঘাতই বা কিসে হইবে? যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার মনোমত না হন, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া কালযাপন করিবে। সক্রেটীশের কথা তুমি সবিশেষ অবগত আছ; তিনি কি ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ কর। কিন্তু তোমার তত দূরও আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। আমি তোমার জন্য একটী উপযুক্তা পাত্রী স্থিরীকৃত করিয়াছি। পাত্রীটী তোমারই অনুরূপা এবং সর্ব্বপ্রকারে তোমারই যোগ্যা। বালিকাটিকে দেখিয়া অবধি আমার মনে হইয়াছে, ভগবান্ তাহাকে তোমারই জন্য এবং তোমাকে তাহারই জন্য অভিপ্রেত করিয়াছেন। আর তাঁহার এই মঙ্গল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই বুঝি তিনি তোমাদিগকে পরস্পরের নিকটে আনয়ন করিয়াছেন। আমি কাহার কথা বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছ—গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা যোগমায়া।”

এই বলিয়া পিতৃদেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি আর কি উত্তর দিব? উত্তর দিবার আর মুখ ছিল না। নিজের সুখান্বেষণ করিতে গিয়া, আমি জননীদেবীর সুখ দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করি নাই, পিতৃদেবের স্নেহমিশ্রিত এই মৃদু মধুর তিরস্কার-বাক্যে আমি যার পর নাই লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইলাম। আমি মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ভণ্ড আমি, নরাধম আমি, স্বার্থপর আমি—এইরূপেই কি আমি ধর্ম্মজীবন লাভ করিব? প্রাণ দিলেও যাঁহাদের ঋণের পরিশোধ করা যায় না, বিবাহ করিলে যদি তাঁহাদের যৎসামান্য সন্তোষ সংসাধিত হয়, তবে সে বিবাহ আমি করিব না? তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যোগমায়া যদি নরকের কীটও হয়, তথাপি আমি তাহাকে বিবাহ করিব, এবং বিবাহ করিয়া যদি আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণাও অনুভব করি, তথাপি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন জগতের আর কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া পিতৃদেব বলিলেন "দেবু, তুমি আমার কথায় কি বল?"

আমি বলিলাম "আপনার কথার প্রত্যুত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনার ও জননীর আদেশ ও ইচ্ছা আমার অবশ্য পালনীয়। যোগমায়াই হউক, আর যেই হউক, যাহার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তাহারই সহিত আমার বিবাহ হইবে। কদাপি ইহার অন্যথ হইবে না। কিন্তু যোগমায়ার সহিত বিবাহ দেওয়া যদি আপনাদের মত হয়, তবে এক মাস কাল এ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনা। এক মাস পরে, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন। আমি আপনার নিকট এক মাসের সময় প্রার্থনা করিতেছি।"

পিতৃদেব আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন "আচ্ছা, তাহাই হইবে; আর এক মাস কাল আমিও এখানে থাকিতে পারিতেছি না। কোনও বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে আমায় স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, ইনি এই এক মাস কাল তোমার কাছে পলাশবনেই বাস করেন। মঙ্গলাও কাছে থাকিবে। ভৃত্য এই বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তুমি কি বল?"

আমি বলিলাম "এ অতি সুন্দর প্রস্তাব। মা পলাশ-বনে থাকিলে, আমাকে আর নিত্য দুই বেলা এখানে গতায়াত করিতে হয় না।" তাহার পর জননীর দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলাম "কিন্তু মা, গোস্বামী মশাইয়ের মেয়ের সহিত আমার বিয়ের কথা তুমি বা মঙ্গলা কা'কেও ব'লো না, বা জান্‌তে দিও না। যদি এই কথা হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে, তা হ'লে ওখানে বিয়ে হওয়া সম্বন্ধে গোলযোগ হ'বে, তা ব'লে রাখ্‌চি।"

জননী দন্তে দন্তে জিহ্বা পেষণ করিয়া বলিলেন "বাবা, তা কি আমি ব'ল্‌তে পারি? আর তুমি যখন মানা কর্‌চো, তখন বোল্‌বো কেন?"

মঙ্গলাও বলিয়া উঠিল "দাদাঠাকুর, তুমি বুঝি, আমাকে তাই মনে ক'রেচো। মঙ্গলার পেটের কথা বা'র করে, সংসারে তো এমন কা'কেও দেখি নি।" এই বলিয়া মার্জ্জনী-রঞ্জিত-হস্তা মঙ্গলা দাসী সগর্ব্বে চঞ্চল-পাদবিক্ষেপে অন্যত্র গমন করিল।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া, জননীর অনুরোধক্রমে পিতৃদেব ও আমি স্নানের উদ্যোগ করিতে গেলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আমি বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, জননীদেবীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমারও হৃদয় প্রসন্ন হইল। দুই তিন দিন পরে পিতৃদেব কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলেন; আমরাও পলাশবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে কিয়দ্দিন বাস করিবেন, এই সংবাদ-শ্রবণে গ্রামের মহিলারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। প্রায় প্রত্যহই প্রবীণা ও নবীনারা অবসর-ক্রমে আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সেই সময়ে, আমি প্রায়শঃ বাটীর সংলগ্ন শালবনে প্রবেশ পূর্ব্বক, একটী মনোরম স্থানে সুকোমল তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া, পুস্তকপাঠে নিমগ্ন থাকিতাম। সেখানে অন্য কোনও জনপ্রাণী আসিত না; কেবল কেশব মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমায় দেখিয়া যাইত মাত্র। সেই দিনের ঘটনা হইতে কেশব আমার গতিবিধির উপর বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিত, এবং বনের মধ্যে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতে আমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিত।

আমি পিতৃদেব ও জননীদেবীকে যে এক মাস কাল আমার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার কতিপয় বিশিষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমি এতদিন বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা গম্ভীরভাবে চিন্তা করি নাই। সুতরাং বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য-পথ-নির্ণয়ার্থ একটু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমি মনে করিয়াছিলাম, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহের কথা প্রচারিত হইলে, আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে যাইতে পারিব না, এবং যোগমায়াও আমার সাক্ষাতে কদাচ বাহির হইবে না। এইরূপ ব্যাপার যে কোন মতেই আমার বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় কারণ এই যে, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ দিতে জনকজননী সঙ্কল্প করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণমাত্র যোগমায়াকে ভাল করিয়া দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছাটা আমার মনে স্বতঃই বলবতী হইয়া উঠিল। যোগমায়াকে যে ইতঃপূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা নহে। কিন্তু কি-জানি-কেন সে দেখাটা আমার নিকট যেন "ভাল করি পেখন না ভেল" বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। বিবাহের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িলে, এই প্রেক্ষণের সুবিধা না ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল।

এইরূপ নানা কারণে, পিতামাতার নিকট আমি উক্ত প্রকার প্রস্তাব করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাঁহারা আমার ঐ প্রস্তাবের কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমার দূরদর্শিতার ফল আমি সদ্য সদ্যই দেখিতে পাইলাম। জননী পলাশবনে আসিয়া দুই চারিবার গোস্বামী মহাশয়দের বাটী গিয়াছিলেন ; গোস্বামী মহাশয়ের পত্নীও পুত্রকন্যা সহ দুই চারিবার আমাদের বাটী আসিয়াছিলেন। তাহার পর, সাংসারিক কার্য্যাদি নিবন্ধন মা'র কিম্বা গোস্বামী-পত্নীর প্রায়ই

পরস্পরের গৃহে যাওয়া আসা ঘটিত না; কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র-কন্যাদের তৎসম্বন্ধে সেরূপ কোনও বাধা বিঘ্ন ছিল না। তাই তাহারা প্রায় প্রত্যহই আহারাদির পর আমাদের বাটিতে আসিত। জননীদেবী তাহাদিগকে তো স্বভাবতঃই ভাল বাসিতেন; এক্ষণে সেই ভালবাসা নানা কারণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বালকবালিকারাও জননীদেবীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। তাহারা নিয়তই আমাদের বাটীতে যাতায়াত করিত। যদি কোনও দিন কোনও কারণে না আসিতে পারিত, জননীদেবী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আনয়নের জন্য মঙ্গলাকে প্রেরণ করিতেন। আমি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহে বড় একটা থাকিতাম না। আমি প্রায়শঃ এই সময়ে বনমধ্যে সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে শয়ন করিয়া ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিতাম।

একদিন গ্রামের মহিলারা চলিয়া গেলে, আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া পাঠাগারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার পুস্তক গুলি কে অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। কেশব পুস্তকগুলি প্রত্যহ ঝাড়িয়া রাখিত বটে; কিন্তু সে তাহাদিগকে যথোপযুক্তরূপে বিন্যস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু আজ তাহাদিগকে সাজানো-গোছানো দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মঙ্গলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মঙ্গলা, আজ আমার বই গুলি কে এমন ক'রে সাজালে?"

মঙ্গলা একটু গম্ভীরভাবে বলিল "যার-কাজ, দাদাঠাকুর, সেই সাজিয়েচে।"

আমি বলিলাম "কই, কেশব তো একদিনও এমন ক'রে বই সাজিয়ে রাখ্‌তে পারে না? তবে কি তুই সাজিয়েচিস্?"

মঙ্গলা বলিল "না, দাদাঠাকুর, আমরা কি ওসব কাজ ক'র্‌তে পারি?

ভাল করে ঘর ঝাঁট্ দিতে বল, আনাজ কুট্‌তে বল, বাসন মাজ্‌তে বল, কাপড় কাচ্‌তে বল, তা এমন ক'রে ক'রবো যে, কেউ চোখের মাথা খেয়ে একটুও খুঁৎ ধর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমরা মুখ্‌খু শুখ্‌খু নোক, আমারা কি তোমার বই গুছিয়ে রাখ্‌তে পারি? যে সংস্ক জানে, ভট্‌চাযি্যর মতন পড়্‌তে পারে, আর নেখাপড়ায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত, সে নইলে কি আর কেউ ওসব কাজ ক'র্‌তে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তবে কে সাজালে? মা তো এ ঘরে আসেন নাই? সংস্ক কে জানে? ভট্‌চাযি্য কে?"

মঙ্গলা বলিল "তা কি জানি! মা তো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্পেই মত্ত ছিলেন; ওঁর অপ্সর কোথায়? আর অপ্সর থাক্‌লেই কি উনি তোমার বই এমন করে সাজিয়ে রাখ্‌তে জানেন?"

আমি ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলাম "তবে কি ভূতে বই সাজিয়ে গেল?"

মঙ্গলা ভূতের বড় ভয় করিত।

ভূতের নামে সে শিহরিয়া উঠিল; তার পরেই বলিতে লাগিল "আ আমার পোড়া কপাল! ভূতে সাজাবে কেন গো? তোমারি কি ধারার কথা গো? ভূতেই এই সব কাজ করে না কি?"

আমি আরও একটু চড়িয়া বলিলাম "তবে কে সাজালে রে, পোড়ার মুখি, তাই খুলে বল্ না?")

(মঙ্গলার মুখখানা মেঘের মত হইল। চক্ষু দুটী যেন ছল ছল করিতে লাগিল; সে বলিল "দাদাঠাকুর, তুমি গাল দিচ্চ, দাও; আমি কিন্তু কিছু জানি টানি নে। আমি নিজের কাজেই ব্যস্ত; কে তোমার বই সাজালে, কে তোমার কি কল্লে, অত শত খবর আমি রাখি নে; আর রাখ্‌বার আমার অপ্‌সরও নেই।" এই বলিয়া মঙ্গলা গমনোদ্যতা হইল।

আমি বলিলাম "বেশ কথা, যাও। কিন্তু দেখো, এঘরে আর একলা এস না। ঐ যে জানালার কাছে চাঁপা গাছটি দেখ্‌চো,—যার ডাল এসে জানালার ভিতর উঁকি মার্‌চে,—ঐ গাছে একটী ব্রহ্মদৈত্যি আছে। সেই মাঝে মাঝে এসে আমার বইগুলি গুছিয়ে টুছিয়ে যায়। আজও ভর্ত্তি দুপুর বেলা সে নিশ্চয়ই এসে থাক্‌বে। আমি বামুন কিনা; এই পৈতে দেখে কিছু বলে না। কিন্তু তুই শূদ্দুরের মেয়ে—খপরদার এ ঘরে একলা আসিস্ না; একলা দেখ্‌তে পেলেই তোর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষে খাবে। এইটী বুঝে শুঝে কাজ কর্ম্ম করিস্।"

ব্রহ্মদৈত্যের কথা শুনিতে শুনিতে, মঙ্গলা ভয়ে চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। বৈকালের সময় সিঁড়ি প্রায় অন্ধকারময় হইয়াছিল। কেশব যে উপরে আসিতেছিল, তাহা মঙ্গলা দেখিতে পায় নাই। ভয়ে তাহার কিছু দেখিতে না পাইবারও কথা। যেমন মঙ্গলা কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে, অমনি কেশব আহত হইয়া ক্রোধে তাহাকে এক চড় মারিয়াছে। মঙ্গলা তাহাকে সত্য সত্যই ব্রহ্মদৈত্য মনে করিয়া "বাপ্‌রে, ম'লাম রে, বেহ্মদৈত্যিতে খেলে রে," এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে তিন চারিবার আছাড় খাইয়া নীচের বারাণ্ডায় গিয়া পড়িল। তাহার চীৎকার শুনিয়া জননী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'লো মঙ্গলা? কি হ'লো মঙ্গলা?"

আর কি হ'লো মঙ্গলা! মঙ্গলা কি আপনাতে আপনি আছে যে, সে উত্তর দিবে? মঙ্গলা কেবল চীৎকার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ও, মা গো—আমায় বেহ্মদৈত্যিতে ধ'রে ছিল গো—আমি এখনি ম'রে ছিলুম গো"—

জননী বলিলেন "বেহ্মদৈত্যি কি লো? বেহ্মদৈত্যি কোথায় লো?"

"ও গো, সিঁড়িতে গো!"

মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সিঁড়িতে কি লো? এই যে কেশব উপরে যাচ্ছিল! তা'কেই তো আমি উপরে পাঠালুম! দেখ্, ছুঁড়ি, তুই চোখে দেখ্‌তে না পেয়ে বুঝি তারই ঘাড়ে প'ড়েচিস্?"

মঙ্গলা ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিল "ওমা, কেশব হ'বে কেন গো? ওমা, বেহ্মদৈত্যিটা যে কালো ঢেঙ্গা মুস্কো জোয়ানটার মতন গো! ওমা, আর একটু হ'লেই যে আমার ঘাড়টা মট্‌কে ফেলেছিল গো!"

মঙ্গলার কথা শেষ না হইতে হইতে কেশব নীচে গিয়া বলিল "মা ঠাকুরাণ, সত্যি বটে, আর একটুকু হ'লেই আমি ইয়ার ঘাড়টা মচাড়ে ফেল্‌ত্যাম। ঈ আমার নাকের উপরে এমন জোরে মাথা ঠুকেছিল, যে এখনও নাকটা ঝন্‌ঝনাচ্চে!"

মঙ্গলা তখন দাঁড়াইয়া বলিল "হেঁ রে ছোঁড়া, তুই আস্‌ছিলি, তা আমায় ব'ল্‌তে নেই? আর তোর হাত কি শক্ত রে? হেঁ রে এমনি জোরেই চড় মার্‌তে হয়?—মা গো—আমি তোমায় গড় কর্‌চি গো—তুমি আমায় ছেড়ে দাও গো—আমি আর তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌ব না গো—বাপ্‌রে, আমায় একটা চাকরের হাতেও মার খেতে হ'লো? বগলা ঠাকুরোন আমায় এখানে আস্‌তে সত্যিই মানা ক'রে ছিল গো! দাদা ঠাকুরের কেশবা এক বেহ্মদৈত্যি; আবার তার সত্যিকার একটা বেহ্মদৈত্যি আছে গো। সে নাকি জানালার ধারে ঐ চাঁপাগাছে থাকে! মা গো, তোমরা বামুন গো, তোমাদের সে কখনও কিছু কর্‌বে না গো। আমি শূদ্দুরের মেয়ে, সে কোন্ দিন আমারই প্রাণটা বধে ফেল্‌বে গো। সে দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা কয়

আর তার বই সাজিয়ে দিয়ে যায়। আজ নাই যোগমালা ও আমি বই সাজিয়েছিলাম, কিন্তু সে যে নিতিই বই সাজিয়ে দিয়ে যায় গো। যদি কেশ্‌বার হাতে বাঁচি, তা হ'লে তার হাতে যে রক্ষে নেই গো! হায়, হায়, মা গো—শেষকালে বেহ্মদৈত্যির হাতে আমার মরণ ছিল?" এই কথা বলিতে বলিতে মঙ্গলা দাসীর শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। সে পা ছড়াইয়া, সপ্তমে স্বর তুলিয়া, মৃত জননীকে উদ্দেশ করিয়া দস্তুরমত ক্রন্দন করিতে বসিল। সেই ক্রন্দন-গীতির অনেকগুলি করুণ পদ ছিল; কিন্তু তাহার প্রধান ধূয়ার অর্থ এই প্রকারঃ—"মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী তাহাকে কি বেহ্মদৈত্যির হাতে মরিবার জন্যই গর্ভে ধরিয়াছিল?")

মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী আজ বাঁচিয়া থাকিলে, অবশ্যই আদরিণী কন্যার এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিত। কিন্তু তদ্বিষয়ের কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, অগত্যা আমার জননীদেবীই মঙ্গলাকে তাহার প্রশ্নের একটা সদুত্তর দিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাহাতে মঙ্গলা দাসীর কণ্ঠস্বর নিবৃত্ত না হইয়া অপ্রত্যাশিতরূপে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জননীদেবী অবিচারিতচিত্তে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন।

মঙ্গলা বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন থাকায় এতক্ষণ চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া দেখিল, তাহার নিকটে কেহই নাই! মঙ্গলা তবে এতক্ষণ অরণ্যে রোদন করিতেছিল! ঠিক্ এই সময়ে কেশবচন্দ্র মঙ্গলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "ও মঙ্গলা, তুই অত কাঁদ্‌চুস্ কেনে? বেহ্মদৈত্যি কুথায় যে, তোর ঘার মোচাড়্‌বেক্? বেহ্মদৈত্যি থাক্‌লে আমাকে এতদিন রাখ্‌তোক না কি? আমি যে কত দিন এক্‌লাই এই ঘরে শুয়েছিল্যাম।"

কেশবকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া মঙ্গলা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল "ওরে, ড্যাংপিটে, সর্ব্বনেশে ছোঁড়া, তুই বকিস্‌নে, পালা আমার সাম্‌নের থেকে—ওরে ছোঁড়া, বেহ্মদৈত্যি তোর আর কি ক'র্‌বে? ম'লে তুইও যে বেহ্মদৈত্যি হবি রে।"

কেশব বলিল, "আচ্ছা, এখন গাল দিচ্ছ্‌স, দে; রেতের বেলায় দেখা যাবেক্‌। হে বেহ্মদৈত্যি ঠাকুর, তুমি সব শুনে রাখ্‌বে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মঙ্গলার বড় ভয় হইল। কেশব চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জননীর নিকট গমন করিল এবং অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল:— "মা, দাদাঠাকুরের শীগ্‌গীর বিয়ে দিবে তো দাও, আমি আর এখানে থাকতে পার্‌বো না। দাদাঠাকুর বউ নিয়ে এখানে থাকুক। আমরা আমাদের বাড়ীতে যাই চল; বন জঙ্গলে আমাদের কাজ নেই; আমাদের সেই বাড়ীই ভাল। ওগো যেমনি দাদাঠাকুর, বউটীও তেমনি হ'বে দেখ্‌চি। বউ কত লেখাপড়া জানে, সংস্ক জানে, ভট্‌চায্যি ঠাকুরের মতন মন্‌তর পড়ে, আবার দাদাঠাকুরের মতন বনে বেড়া'তেও ভাল বাসে। সে আইবুড় মেয়ে, রোজ রোজ বনে ফুল তুল্‌তে যায়। হ্যাঁগা, বলি, আইবুড় মেয়ের কি যখন তখন ফুলের গাছ ছুঁতে আছে? ফুলগাছে ঠাকুর দেবতা কত-কি থাকে। কখন্ কি হবে, তার ঠিক্ কি? এদের কারুর সঙ্গেই আমার ব'ন্‌বে না, বাছা। আবার চাকরটিও তেমনি হ'য়েচে। বাবা বাড়ী এলেই দাদাঠাকুরের শীগ্‌গীর বিয়ে দিয়ে দাও। আমি আর এখানে থাকৃতে পার্‌বো না। আমি গরীবের বাছা; কোন্ দিন ভূতের হাতে আমার পরাণটা যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মঙ্গলা চুপ করিল। বোধ হয়, ভূতের হাতে মরণের কথা ভাবিয়া তাহার চক্ষে আবার জল আসিয়াছিল।

জননী বলিলেন "তুই ছুঁড়ি কেঁদে মরিস্ কেন? ভূত দেখা দূরে থাক্, ভূতের নাম শুনেই যে ম'লি! দেবুর সঙ্গে তুই লাগিস্, তাইতো দেবু তো'কে ভয় দেখায়?"

মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "হেঁ, আমিই লাগি বুঝি? তুমি তো সব জান? আগে বিয়ের নামে জ্ব'লে যেত, এখন একশ বার যোগমালার কথা জিজ্ঞেস করা হ'চ্চে! আমি মেয়ে মানুষ, অত মার পেঁচ কি বুঝ্তে পারি? আর ওঁর মত বেহায়াপনাও আমি ক'র্তে পারি না।"

আমি দেখিলাম, তামাসা মন্দ নয়। ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলাম "মঙ্গলা।"

মঙ্গলার কণ্ঠস্বর একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই বৃহৎ বাটী খানিতে অনেকক্ষণ আর মানব-কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলার প্রকৃতিই এইরূপ। মঙ্গলা মিথ্যা কথার একটী বৃহদায়তন ঝুড়ি। মঙ্গলা যাহাকে বুঝিতে পারে না, তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার পৃষ্ঠে বিষদন্ত বসাইয়া দেয়। মঙ্গলার দংশনে প্রাণের কোনও আশঙ্কা হয় না বটে, কিন্তু তাহার জ্বালা বড়ই তীব্র, এবং সেই জ্বালা ক্ষণস্থায়িনী হইলেও যার পর নাই অসহ্য। আধ্যাত্মিক অর্থে, বগলা-সুন্দরী ও মঙ্গলাদাম্নী উভয়েই সহোদরা; কেহ কেহ বলেন, যমজভগিনী। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এই কারণে সকলেই ইহাদিগকে ভয় করিত; আমিও করিতাম।

মঙ্গলা যতক্ষণ প্রসন্না থাকে, ততক্ষণ সে মঙ্গলময়ী। কোনও কারণে অপ্রসন্না হইলে, সে মূর্ত্তিমতী চণ্ডী। যাহার উপর মঙ্গলার ক্রোধ হয়, সুযোগ পাইলে মঙ্গলা তাহাকে নিজ হলাহল দ্বারা জর্জ্জরিত করিবেই করিবে। কিন্তু ক্রোধের নিবৃত্তি হইয়া গেলে, মঙ্গলা নিজের উপর উৎপীড়ন, আক্রোশ ও প্রতিহিংসার আশঙ্কা করিতে থাকে। এই

কারণে সে যতক্ষণ অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে আর কিছুতেই শান্তি থাকে না। তোষামোদ, ক্রন্দন, অসরল অপরাধ-স্বীকার যেরূপেই হউক, সে অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইবে না। মঙ্গলার প্রধান ভয়, পাছে কেহ শত্রুতাচরণ করিয়া তাহাকে কোনও ভৌতিক ব্যাপারে ফেলিয়া দেয়! মঙ্গলা মৃত্যু অপেক্ষাও ভূতকে অধিকতর ভয় করিত! এই ভূতভীতিই মঙ্গলাকে মানবীর পদে অবিচ্যুত রাখিয়াছিল। নতুবা সে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে ?

যাহা হউক, অপকৃত ব্যক্তিকে কোনও রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই মঙ্গলার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মঙ্গলা অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া বসিত। এইরূপে প্রায় দেশশুদ্ধ লোকেরই সহিত মঙ্গলার বিবাদ হইত, আবার দুই দিন পরে অক্লেশে সেই বিবাদ মিটিয়াও যাইত। বিবাদ মিটিয়া যাইত বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে দুইটী চক্ষে দেখিতে পারিত না।

আমাদের গৃহেও মঙ্গলা প্রচুর অশান্তি আনয়ন করিত। মঙ্গলা জনকজননীহীন এবং অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অনাথা হইলে, জননীদেবী তাহাকে আমাদের গৃহে আশ্রয় দেন। সেই অবধি সে আমাদের গৃহে, যেন আমাদের কোনও আত্মীয়ার ন্যায়, বাস করিতেছে। আমরা কেহই তাহাকে একটী দিনও দাসী বলিয়া ভাবি নাই। জননীদেবী তাহাকে মাতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সমস্ত "জ্বালা"ই অম্লানবদনে সহ্য করিতেন। আমরাও তাহাকে আমাদের ভগিনীর তুল্য মনে করিতাম। আমি যখন বালক ছিলাম, তখন মঙ্গলা আমাকে মধ্যে মধ্যে তাড়না করিত। আমিও সেই কারণে তখন তাহাকে একটু মানিয়া চলিতাম! এখন আমি বড় হইয়াছি; বড়